জুলাই ২০১৯ ▪ আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪২৬

সচিত্র বাংলাদেশ

উন্নয়নের মাইলফলক জাতীয় বাজেট ২০১৯-২০২০

শতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মানুষের অস্তিত্ব রক্ষায় প্রকৃতি সংরক্ষণের গুরুত্ব

বাংলাদেশের জনসংখ্যা উন্নয়নের মূল শক্তি

সচিত্র বাংলাদেশ

দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি
বিষয়ক পত্রিকা

- যে-কোনো বিষয়ে লেখা পাঠানো যায়।
- লেখা সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। লেখার সাথে চিত্র দেওয়া হলে তা ক্যাপশনসহ প্রেরণ করা আবশ্যক।
- প্রতিটি লেখার জন্য লেখক সম্মানী দেওয়া হয়।
- হার্ডকপির সাথে সিডি বা ই-মেইলে লেখা পাঠানো হলে তা অধিকতর গ্রহণযোগ্য।
- e-mail: editorsb@dfp.gov.bd
  dfpsb@yahoo.com

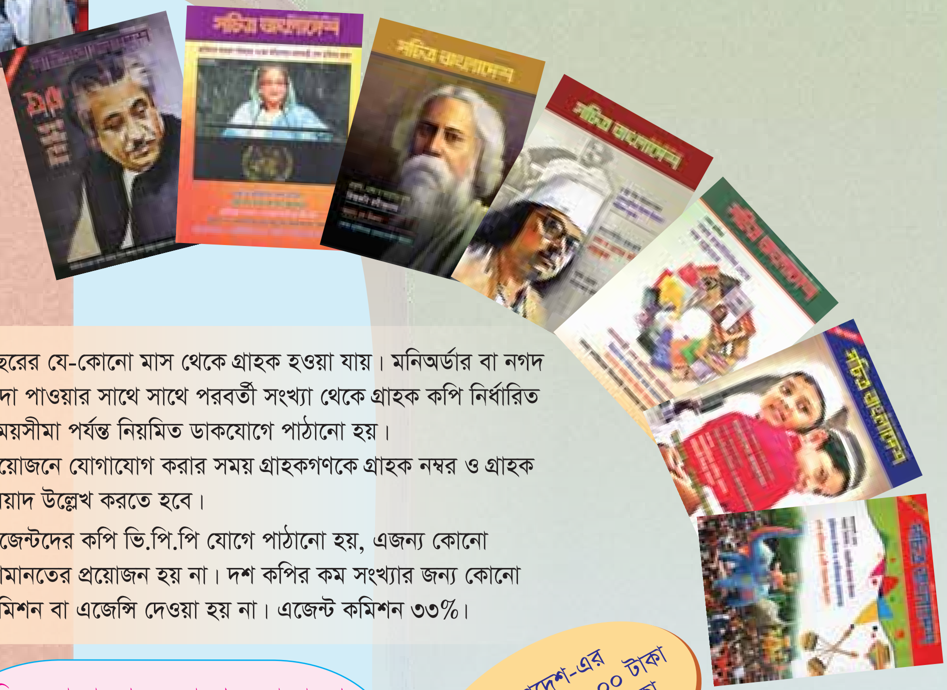

- বছরের যে-কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। মনিঅর্ডার বা নগদ চাঁদা পাওয়ার সাথে সাথে পরবর্তী সংখ্যা থেকে গ্রাহক কপি নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত নিয়মিত ডাকযোগে পাঠানো হয়।
- প্রয়োজনে যোগাযোগ করার সময় গ্রাহকগণকে গ্রাহক নম্বর ও গ্রাহক মেয়াদ উল্লেখ করতে হবে।
- এজেন্টদের কপি ভি.পি.পি যোগে পাঠানো হয়, এজন্য কোনো জামানতের প্রয়োজন হয় না। দশ কপির কম সংখ্যার জন্য কোনো কমিশন বা এজেন্সি দেওয়া হয় না। এজেন্ট কমিশন ৩৩%।

সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ, বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি ও অ্যাডহক প্রকাশনাসমূহ সহজে পেতে এই ০১৫৩১৩৮৫১৭৫ বিকাশ নম্বরে যোগাযোগ করে টাকা পাঠিয়ে দিন।

সচিত্র বাংলাদেশ-এর
বার্ষিক চাঁদা ৩০০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১৫০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২৫.০০ টাকা

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন

www.dfp.gov.bd

www.facebook.com/sachitrabangladesh/

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর

জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ

[১৭ মার্চ ২০২০-১৭ মার্চ ২০২১]

উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে

পোস্টার ডিজাইন আহ্বান

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ (১৭ মার্চ ২০২০ থেকে ১৭ মার্চ ২০২১) উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আকর্ষণীয় বর্ণিল পোস্টার ডিজাইন আহ্বান করা যাচ্ছে। ৩০ আগস্ট ২০১৯ তারিখের মধ্যে দেশে ও দেশের বাইরে বসবাসরত আগ্রহী বাংলাদেশী নাগরিকদের ডিজাইন পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ডিজাইনে অনুসরণীয় বিষয়সমূহ:

১. **পোস্টারের আকার:** ২০´´ x ৩০´´ / ২৩´´ x ৩৬´´

২. **স্লোগান:** পোস্টারে আকর্ষণীয় স্লোগান তৈরি করে দেয়া যেতে পারে অথবা স্লোগান স্থাপনের জায়গা রেখে ডিজাইন করা যেতে পারে।

৩. **লোগো:** পোস্টারের ডিজাইনে মুজিব বর্ষের লোগোর জন্য জায়গা নির্দিষ্ট করে রাখতে হবে।

৪. **পোস্টার:** 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী' উদ্‌যাপন এবং 'মুজিববর্ষ' [১৭ মার্চ ২০২০ থেকে ১৭ মার্চ ২০২১] কথাগুলো থাকতে হবে।

৫. **সফটকপি:** Illustrator-6/EPS Outline AI File-এ প্রস্তুত করতে হবে।

৬. **পুরস্কার:** নির্বাচিত সেরা ৫ (পাঁচ)টি ডিজাইনের জন্য ডিজাইনারদের পুরস্কৃত করা হবে।

৭. **ই-মেইলে ডিজাইন পাঠানোর ঠিকানা:** mujib100posters@gmail.com

৮. **ডাকযোগে অথবা সরাসরি হার্ডকপি, সিডি, পেনড্রাইভে ডিজাইন পাঠানোর ঠিকানা:**
মহাপরিচালক, **চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর,** ১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ০২-৮৩৩১০৩৪

৯. অমনোনীত ডিজাইন ফেরত দেওয়া হবে না।

মিডিয়া, প্রচার ও ডকুমেন্টেশন উপকমিটি
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী
উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট
১/১ সেগুনবাগিচা, ঢাকা

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 40, No. 01, July 2019, Tk. 25.00

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা।

সচিত্র বাংলাদেশ
জুলাই ২০১৯ ■ আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪২৬

সচিত্র বাংলাদেশ

জুলাই ২০১৯ ▫ আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪২৬

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭ই জুন ২০১৯ জাতীয় সংসদে অর্থমন্ত্রীর পক্ষে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেট প্রসঙ্গে আলোচনা করেন–পিআইডি

সম্পাদকীয়

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট ৩০শে জুন জাতীয় সংসদে পাস হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো আকারের বাজেট এটি। এ বাজেটে ব্যয় ধরা হয়েছে ৫ লাখ ২৩ হাজার ১৯০ কোটি টাকা। ১৩ই জুন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল সংসদে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য বাজেট প্রস্তাব উপস্থাপন শুরু করেন। অর্থমন্ত্রীর অসুস্থতার কারণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাজেটের অবশিষ্ট অংশ উত্থাপন করেন। বাজেটোত্তর সংবাদ সম্মেলনেও সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দেন প্রধানমন্ত্রী। বাজেট আলোচনায় অংশ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, '২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এসডিজি অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে'। তিনি আরো বলেন, 'এলক্ষ্য পূরণ এবং আমাদের নির্বাচনি ইশতাহার পূরণের এক কার্যকর মাধ্যম হবে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য পেশকৃত জনবান্ধব, উন্নয়নমুখী এই বাজেট'। আমাদের বিশ্বাস– এই বাজেট বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রাকে সামগ্রিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এ সংখ্যায় বাজেট নিয়ে রয়েছে দুটি প্রবন্ধ।

১লা জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস। ১৯২১ সালের এ দিনে অনেক বাধাবিপত্তি তথা ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে জাতির বীর সন্তানদের প্রচেষ্টা ও ত্যাগের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এ বিশ্ববিদ্যালয়। শুধু শিক্ষা ক্ষেত্রেই নয়, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বলা হয় 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড'। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে প্রত্যাশা– এ বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবোজ্জ্বল অবস্থান সুদৃঢ় হোক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে রয়েছে একটি প্রবন্ধ।

১১ই জুলাই বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস। বাংলাদেশে বিপুল জনসংখ্যার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা একটি চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তরে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে সরকার। এলক্ষ্য পূরণে গ্রহণ করেছে নানামুখী উদ্যোগ। এ বিষয়ে একটি নিবন্ধ রয়েছে এ সংখ্যায়।

বিশ্ব প্রকৃতি সংরক্ষণ দিবস, পবিত্র হজ ও বর্ষার ফুল– এ তিনটি নিবন্ধ এবারের সংখ্যায় স্থান পেয়েছে।

এছাড়া রয়েছে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রবন্ধ ও নিবন্ধ। আরো আছে কবিতা ও গল্পসহ নিয়মিত অন্যান্য প্রতিবেদন।

আশা করি, সংখ্যাটি সবার ভালো লাগবে।

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন
সম্পাদক
সুফিয়া বেগম

কপি রাইটার
মিতা খান
সহ-সম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন
অলংকরণ: নাহরীন সুলতানা
আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৯৩৩২১২৯, ৪৯৩৫৭৯৩৬
E-mail : editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা।
নিয়মিত গ্রাহক হওয়ার জন্য যোগাযোগ : **সহকারী পরিচালক**
(বিক্রয় ও বিতরণ), চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর;
স্থানীয় এজেন্ট এবং সকল জেলা তথ্য অফিস।

সূ চি প ত্র

সম্পাদকীয়
সূচিপত্র
নিবন্ধ/প্রবন্ধ
উন্নয়নের মাইলফলক জাতীয় বাজেট ২০১৯-২০২০ ৪
এম এ খালেক
তাজউদ্দীন আহমদ: জন্মদিনের শ্রদ্ধাঞ্জলি ৯
খালেক বিন জয়েনউদদীন
বাজেট ২০১৯-২০২০: সমৃদ্ধির মেগা বাজেট ১১
মোতাহার হোসেন
শতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৩
রেহানা শাহনাজ
মানুষের অস্তিত্ব রক্ষায়: প্রকৃতি সংরক্ষণের গুরুত্ব ১৪
শামস সাইদ
বাংলাদেশের জনসংখ্যা উন্নয়নের মূল শক্তি ১৭
মাহবুব রেজা
বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলন: একটি সমীক্ষা ১৯
বদরু মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান
হজের পূর্বাপর ২১
খান চমন-ই-এলাহি
বর্ষার ফুল ২৩
মিতা খান
মাদিবা ম্যান্ডেলা ২৫
নাজমা ইসলাম
উপমহাদেশের প্রথম নারী চলচ্চিত্রকার ফাতেমা বেগম ২৬
অনুপম হায়াৎ
আন্তর্জাতিক প্লাস্টিক ব্যাগমুক্ত দিবস ২৭
পিনক আলম
ঐতিহাসিক তথ্য বিকৃতির জন্য এ কে খন্দকারের ক্ষমা প্রার্থনা ২৮
কে সি বি তপু
প্রকৃতির অপূর্ব কারুকাজ সুন্দরবন ৩০
লিলি হক
রোহিঙ্গা ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব মানবতার প্রতীক ৩১
মীর আফরোজ জামান
ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংশীদার চরফ্যাশনের উদ্যোক্তা রহিম ও সাফিয়া ৩২
মো. শাহেদুল ইসলাম
বাঘ সংরক্ষণে সমন্বিত উদ্যোগ ৩৩
ভাস্করেন্দু অর্ণবানন্দ
জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব ৩৫
ফারিহা হোসেন

আপনার শিশুকে সাঁতার শেখান ঝুঁকিমুক্ত থাকুন ৩৬
জিনাত আরা আহমেদ

বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস ৩৭
সানজিদা আহমেদ

বিশ্ব হেড-নেক ক্যান্সার দিবস ৩৮
শাওন আহমেদ

গল্প

হায়েনার থাবা ৩৯
নাসিম সুলতানা

কবিতাগুচ্ছ ১৬, ৩৮, ৪১, ৪২, ৪৩

জাকির আবু জাফর, মিয়াজান কবির, ম. মীজানুর রহমান
হেলাল হাফিজ, সৈয়দ শাহরিয়ার, জাকির হোসেন চৌধুরী
সোহরাব পাশা, মুহাম্মদ ইসমাঈল, আতিক আজিজ
সৈয়দ লুৎফুল হক, রেহানা, নুসরাত জাহান, চিত্তরঞ্জন সাহা চিতু
রুমী ইসলাম, দেলোয়ার হোসেন, মো. জাহাঙ্গীর আলম
আ. আউয়াল রনী, জাহানারা জানি, আপন চৌধুরী, সোহেল রানা

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি ৪৪
প্রধানমন্ত্রী ৪৫
তথ্যমন্ত্রী ৪৬
জাতীয় ঘটনা ৪৭
আন্তর্জাতিক ৪৮
উন্নয়ন ৪৯
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৫০
শিল্প-বাণিজ্য ৫০
শিক্ষা ৫১
বিনিয়োগ ৫২
নারী ৫২
সামাজিক নিরাপত্তা ৫৩
কৃষি ৫৩
কর্মসংস্থান ৫৪
পরিবেশ ও জলবায়ু ৫৫
নিরাপদ সড়ক ৫৬
যোগাযোগ ৫৬
স্বাস্থ্যকথা ৫৭
মাদক প্রতিরোধ ৫৭
প্রতিবন্ধী ৫৮
শিশু ও কিশোর উন্নয়ন ৫৯
সংস্কৃতি ৫৯
চলচ্চিত্র ৬০
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ৬১
ক্রীড়া ৬২
শ্রদ্ধাঞ্জলি: বরেণ্য সংগীত শিল্পী ও গবেষক খালিদ হোসেন আর নেই ৬৪

হাইলাইটস

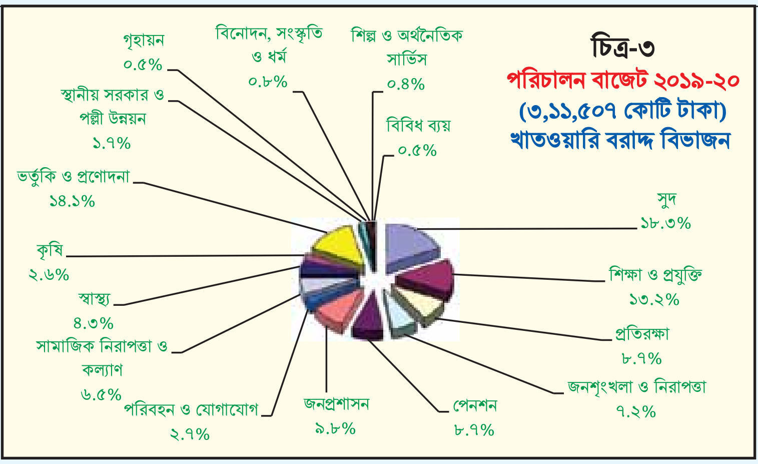

চিত্র-৩
পরিচালন বাজেট ২০১৯-২০
(৩,১১,৫০৭ কোটি টাকা)
খাতওয়ারি বরাদ্দ বিভাজন

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট বাংলাদেশের ৪৯তম জাতীয় বাজেট। এ বাজেট বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। দেশের অর্থনীতির আকার যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি বাজেটের আয়তনও বেড়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেটের শিরোনাম– 'সমৃদ্ধ আগামীর পথযাত্রায় বাংলাদেশ: সময় এখন আমাদের, সময় এখন বাংলাদেশের'। এবারের বাজেটে সম্ভাব্য ব্যয় ৫ লাখ ২৩ হাজার ১৯০ কোটি। এবারের বাজেট আকারে সবচেয়ে বড়ো। চলতি অর্থবছরের বাজেট জাতীয় সংসদে উপস্থাপন, পাস হওয়া এবং বাজেটোত্তর সাংবাদিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ– সব মিলিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক অনন্য রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। এবারের সংখ্যায় বাজেট নিয়ে 'উন্নয়নের মাইলফলক: জাতীয় বাজেট ২০১৯-২০২০' এবং 'বাজেট ২০১৯-২০২০: সমৃদ্ধির মেগা বাজেট' শীর্ষক দুটি প্রবন্ধ রয়েছে। প্রবন্ধ দুটি দেখুন যথাক্রমে পৃষ্ঠা-**৪** ও **১১**

শতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১লা জুলাই ১৯২১। এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় এদেশের অনেক বীর সন্তানের ত্যাগ ও শ্রম রয়েছে। শিক্ষা প্রসার ছাড়াও রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের উন্নত বাংলাদেশ গড়তে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে রয়েছে একটি প্রবন্ধ। দেখুন পৃষ্ঠা-**১৩**

মানুষের অস্তিত্ব রক্ষায় প্রকৃতি সংরক্ষণের গুরুত্ব

২৮শে জুলাই বিশ্ব প্রকৃতি সংরক্ষণ দিবস। পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়ে মানুষকে সচেতন করার জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন দিবস পালন করা হয়। বন ও বন্যপ্রাণীর সঙ্গে মানুষের জীবন ও জীবিকার যেমন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে, তেমনি বন রক্ষার সঙ্গে জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ রক্ষাও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বিশ্ব প্রকৃতি দিবস উপলক্ষে 'মানুষের অস্তিত্ব রক্ষায় প্রকৃতি সংরক্ষণের গুরুত্ব' শীর্ষক নিবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা-**১৪**

বাংলাদেশের জনসংখ্যা উন্নয়নের মূল শক্তি

বাংলাদেশের দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনসংখ্যা জনশক্তি হিসেবে পৃথিবীতে আজ স্বীকৃত। বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, প্রবাসী আয় বা রেমিটেন্স অর্জনকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান পৃথিবীতে নবম। 'বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস' উপলক্ষে একটি নিবন্ধ দেখুন পৃষ্ঠা-**১৭**

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail: editorsb@dfp.gov.bd, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : রূপা প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং, ২৮/এ-৫ টয়েনবি সার্কুলার রোড মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। ফোন: ৭১৯৪৭২০

১৩ই জুন ২০১৯ জাতীয় সংসদে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট উপস্থাপন করছেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল–পিআইডি

উন্নয়নের মাইলফলক জাতীয় বাজেট ২০১৯-২০২০

এম এ খালেক

বড়ো ধরনের কোনো পরিবর্তন-পরিমার্জন ছাড়াই জাতীয় সংসদে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট পাস হয়েছে। ১৮ই জুন জাতীয় সংসদে বাজেটের ওপর আলোচনা হয়। মোট ৫২ ঘণ্টা আলোচনায় বিরোধী দলীয় ৩৮ জন সদস্যসহ মোট ৩৪৯ জন সংসদ সদস্য আলোচনায় অংশ নেন। উল্লেখ্য, অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল ১৩ই জুন ২০১৯ জাতীয় সংসদে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেট উপস্থাপন করেন। বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যাপক আলোচনার পর ৩০শে জুন ২০১৯ জাতীয় সংসদে বাজেট পাস হয়। ১লা জুলাই ২০১৯ থেকে বাজেট কার্যকর হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেটের শিরোনাম– 'সমৃদ্ধ আগামীর পথযাত্রায় বাংলাদেশ: সময় এখন আমাদের, সময় এখন বাংলাদেশের'।

এটি ছিল বাংলাদেশের ৪৯তম জাতীয় বাজেট। এ বাজেট বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এই বাজেট সঠিকভাবে বাস্তবায়নের ওপর সরকারের চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম নির্ভর করছে। বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে কার্যকর মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের আগেই একটি উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কাজেই একটি কার্যকর এবং সময়োপযোগী জাতীয় বাজেট ছিল খুবই জরুরি। অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল সেই কাজটিই করেছেন। তিনি যেহেতু আগে পরিকল্পনামন্ত্রীর দায়িত্ব অত্যন্ত সফলভাবে পালন করেছেন তাই এবাবের সরকারের অর্থমন্ত্রী হিসেবে বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রেও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। চলতি অর্থবছরের বাজেট হচ্ছে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ অঙ্কের বাজেট। ১৯৭২-১৯৭৩ অর্থবছরে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ প্রথম জাতীয় বাজেট প্রণয়ন করেছিলেন। সেই বাজেটের আকার ছিল ৭৮৬ কোটি টাকা। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য প্রণীত বাজেটে সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে ৫ লাখ ২৩ হাজার ১৯০ কোটি টাকা। মোট আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৩ লাখ ৭৭ হাজার ৮১০ কোটি টাকা। অর্থাৎ বাজেট সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে ১ লাখ ৪৫ হাজার ৩৮০ কোটি টাকা। এই ঘাটতির পরিমাণ মোট জিডিপি'র ৫ শতাংশ, যা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বা গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে রয়েছে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর মোট ১২ জন অর্থমন্ত্রী ও অর্থ উপদেষ্টা জাতীয় বাজেট প্রণয়ন ও পেশ করেন। এর মধ্যে তাজউদ্দীন আহমদ ১৯৭২-১৯৭৩ থেকে ১৯৭৪-১৯৭৫ অর্থবছর পর্যন্ত তিনটি বাজেট পেশ করেন। শাহ এ এম এস কিবরিয়া অর্থমন্ত্রী হিসেবে ১৯৯৭-১৯৯৮ থেকে ২০০১-২০০২ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ৫টি বাজেট পেশ করেন। অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত জাতীয় পার্টির শাসনামলে ১৯৮২-১৯৮৩ ও ১৯৮৩-১৯৮৪ অর্থবছরে দুটি এবং আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকারের সময়ে ২০০৯-২০১০ অর্থবছর থেকে গত অর্থবছর (২০১৮-২০১৯) পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে ১০টি বাজেট পেশ করেন। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এম সাইদুজ্জামান ১৯৮৪ সাল থেকে ১৯৮৭-১৯৮৮ অর্থবছর পর্যন্ত ৪টি বাজেট পেশ করেন। এম এ মুনিম ১৯৮৮-১৯৮৯ এবং ১৯৯০-১৯৯১ অর্থবছরের বাজেট পেশ করেন। সর্বশেষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ উপদেষ্টা হিসেবে ড. এ বি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম ২০০৭-২০০৮ এবং ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরের বাজেট পেশ করেন। ড. এ আর মল্লিক, ড. মির্জা নূরুল হুদা, ড. ওয়াহিদুল হক এবং ড. ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ একটি করে বাজেট পেশ করেন।

দেশের অর্থনীতির আকার যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি বাজটের আয়তনও বেড়েছে। বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে জনগণের চাহিদা পূরণ করে বাজেট প্রণয়ন করা বেশ কঠিন কাজ। কারণ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য অর্থের জোগান দিতে হলে বর্ধিত হারে করারোপ করতে হয়। আর করারোপ করা হলে সাধারণ মানুষের ওপর চাপ বৃদ্ধি পায়, যা তাদের অসন্তুষ্টির কারণ হয়। আক্ষরিক অর্থে বাজেট হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট সময়ের সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের খতিয়ান। কীভাবে অর্থের জোগান নিশ্চিত হবে এবং সেই অর্থ দ্বারা কীভাবে জনকল্যাণ সাধন করা হবে– সেটাই বাজেটের মূল উদ্দেশ্য। আমরা দুই ধরনের বাজেট প্রত্যক্ষ করি। এর মধ্যে একটি হচ্ছে– পারিবারিক বাজেট এবং অন্যটি হচ্ছে– রাষ্ট্রীয় বাজেট। পারিবারিক বাজেটে সাধারণত আয় বুঝে ব্যয়ের খাত নির্ধারণ করা হয়। অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় বাজেটে

ব্যয়ের সম্ভাব্য পরিমাণ বুঝে আয়ের ব্যবস্থা করা হয়। রাষ্ট্র বা সরকার চাইলেই আয় বাড়াতে পারে। তবে সেখানে জনগণের অসন্তুষ্টির ব্যাপারটি সরকারকে মাথায় রাখতে হয়। তাই সুযোগ থাকলেই সরকার জনগণের ওপর ট্যাক্স বৃদ্ধি করে আয় বাড়ানোর চেষ্টা করে না। সরকার সবসময়ই চায়, কীভাবে জনগণের ওপর সীমিত চাপ দিয়ে তার কাঙ্ক্ষিত অর্থের সংস্থান করা যায়।

বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো অসুবিধা হচ্ছে এখানে কর জিডিপি রেশিও খুবই কম। বাংলাদেশে কর জিডিপি রেশিও এখনো ১২ শতাংশের কম। অথচ দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ দেশের কর জিডিপি রেশিও বাংলাদেশের চেয়ে বেশি। বাংলাদেশে কর প্রদানযোগ্য অনেকেই কর প্রদান করেন না। ফলে সরকারকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য অন্য উৎস থেকে অর্থ আহরণের চেষ্টা করতে হয়। চলতি অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) জন্য রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ২ লাখ ৪৮ হাজার ১৯০ কোটি টাকা। এর মধ্যে মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট থেকে আসবে ৩৭ দশমিক ৮ শতাংশ, আমদানি শুল্ক বাবদ আসবে ১১ দশমিক ২ শতাংশ, আয়কর থেকে আসবে ৩৫ শতাংশ, সম্পূরক শুল্ক থেকে আসবে ১৪ দশমিক ৮ শতাংশ এবং অন্যান্য খাত থেকে আসবে ১ দশমিক ২ শতাংশ।

বাংলাদেশের একটি বড়ো সমস্যা হচ্ছে ট্যাক্স জিডিপি রেশিও বাড়াতে না পারা। নানাভাবে চেষ্টা করা সত্ত্বেও ট্যাক্স জিডিপি রেশিও উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে না। সম্প্রতি অর্থনীতি বিষয়ক সংসদীয় কমিটির এক সভায় এ মর্মে তথ্য প্রকাশ করা হয় যে, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের ট্যাক্স জিডিপি রেশিও সবচেয়ে কম।

চলতি অর্থবছরের বাজেট বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ট্যাক্স জিডিপি বৃদ্ধি করাটা একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাজেটে বেশ কিছু ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বিশেষ করে চলতি অর্থবছরের জন্য বর্ধিত হারে করারোপের পরিবর্তে করের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের চেষ্টা লক্ষণীয়। একইসঙ্গে কর আদায় ব্যবস্থাকে অধিকতর স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলক করা হয়েছে। বহুল আলোচিত সংশোধিত ভ্যাট আইন জুলাই ২০১৯ থেকে কার্যকর হয়েছে। সংশোধিত ভ্যাট আইন কার্যকর হলে রাজস্ব আদায় আগের তুলনায় অনেকটাই বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। বাজেটে ভ্যাট খাত থেকে ৯১ হাজার ৩৪৪ কোটি টাকা আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এটা গত অর্থবছরের নির্ধারিত ভ্যাট আদায় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ২২ হাজার ৫৭৬ কোটি টাকা বেশি। চলতি অর্থবছরে আয়কর বাবদ অর্জিত হবে ৮৬ হাজার কোটি টাকা, যা গত অর্থবছরের তুলনায় ২২ হাজার ৯৬৭ কোটি টাকা বেশি। সম্পূরক শুল্ক বাবদ আদায় হবে ৬৮ হাজার ৩৬৫ কোটি টাকা, যা গত অর্থবছরের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১৭ হাজার ৩৪৫ কোটি টাকা বেশি। কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ বলেন, রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা উচ্চাভিলাষী। এটা অর্জিত হবার তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই। কিন্তু অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন, বাংলাদেশের অর্থনীতি যেভাবে বিকশিত হচ্ছে এবং অর্থনীতির বিভিন্ন সূচক যেভাবে ইতিবাচক ধারায় পরিচালিত হচ্ছে তাতে রাজস্ব আদায়ের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। এখনো দেশের অনেকেই আছেন যারা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কর প্রদান করছেন না। এদের যে-কোনো মূল্যেই হোক কর নেটওয়ার্কের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। এজন্য কর প্রদান ব্যবস্থা আরো আধুনিকায়ন করতে হবে। একজন করদাতা যেন কোনো অবস্থাতেই কর প্রদানে হয়রানির শিকার না-হন, তা নিশ্চিত করতে হবে। আগে ভ্যাট প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধাপ ছিল। ফলে অনেকেই কর প্রদানে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতেন। এখন সেই ধাপ অনেকটাই কমিয়ে আনা হয়েছে। ভোক্তা যাতে ভ্যাট প্রদানকালে প্রতারিত না হন সে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। অর্থমন্ত্রী চলতি অর্থবছরের জন্য করদাতা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। বাজেট বক্তৃতায় তিনি বলেন, আমি চলতি অর্থবছরের জন্য আয়কর রিটার্নধারীর সংখ্যা ১৫ লাখে এবং করদাতার সংখ্যা ২৫ লাখে উন্নীত করার কথা বলেছিলাম।

চিত্র-১

পরিচালন ও উন্নয়ন বাজেট : ২০১৯-২০

(৫,২৩,১৯০ কোটি টাকা)

অর্থায়নের উৎস

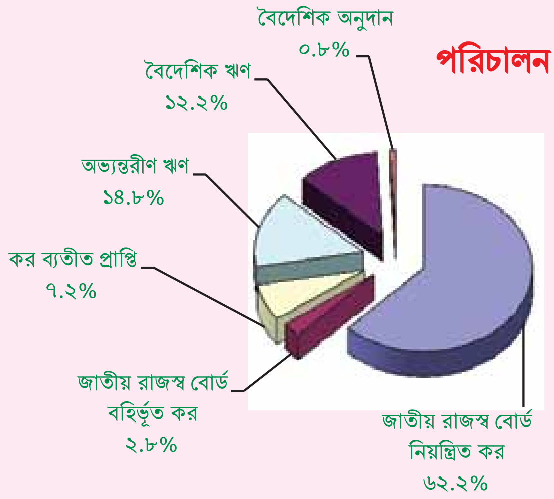

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত করঃ
৩,২৫,৬০০ কোটি টাকা (৬২.২%)

% মূল্য সংযোজন কর	৩৭.৮
আমদানি শুল্ক	১১.২%
আয়কর	৩৫.০%
সম্পূরক শুল্ক	১৪.৮%
অন্যান্য	১.২%

রিটার্নধারীর সংখ্যা ইতোমধ্যেই ১৬ লাখে উন্নীত হয়েছে। একইসঙ্গে আয়করদাতার সংখ্যা ২৯ লাখে উন্নীত হয়েছে। এই অর্থবছরের জন্য আয়কর মুক্ত আয়-সীমা আড়াই লাখ টাকা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। তবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আয়কর মুক্ত আয়-সীমা ২৫ হাজার টাকা বাড়িয়ে ৪ লাখ টাকা করা হয়েছে। রপ্তানিকারকদের করপোরেট ট্যাক্স ৫ শতাংশ কমিয়ে ১৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। সার্বিকভাবে করপোরেট ট্যাক্স আরো কমানোর দাবি ছিল। বাস্তবসম্মত কারণেই সেটা কমানো হয়নি। কারণ করপোরেট ট্যাক্স ব্যাপকভাবে কমানো হলে সরকারি রাজস্ব আয় কমে যেত– যা পূরণ করার জন্য নতুন করে সাধারণ মানুষের ওপর ট্যাক্স বসাতে হতো।

চলতি অর্থবছরের জন্য যে বাজেট প্রস্তাব করা হয়েছে তা নানা কারণেই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। গত অর্থবছরের নানা অর্জনকে বিবেচনায় রেখেই বর্তমানে অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রাসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে। একটি দেশের অর্থনীতির ব্যাপকতা এবং শক্তি পরিমাপের সবচেয়ে বড়ো উপায় হচ্ছে জিডিপি প্রবৃদ্ধি। বিশেষ করে জিডিপি প্রবৃদ্ধি যদি টেকসই এবং স্থিতিশীল হয় তাহলে সেই দেশ অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যেতে পারে। বাংলাদেশ বর্তমানে উন্নয়নের মহাসড়কে ধাবমান রয়েছে। বর্তমান সরকারের বিগত ১০ বছরে বাংলাদেশ অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সূচকে

ইতিবাচক অগ্রগতি সাধন করেছে। বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। জাতিসংঘ বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশের প্রাথমিক মর্যাদা দিয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এটাই সবচেয়ে বড়ো অর্জন। এই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখা গেলে ২০২৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশ চূড়ান্তভাবে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভ করবে। উল্লেখ্য, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মাত্র ৫টি দেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভ করতে সমর্থ হয়েছে। কোনো কোনো দেশ উন্নয়শীল দেশের প্রাথমিক মর্যাদা লাভ করলেও চূড়ান্তভাবে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। যেমন, নেপাল প্রাথমিকভাবে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভ করলেও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে না পারার কারণে চূড়ান্তভাবে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হতে পারেনি। তাই আমাদের উন্নয়নশীল দেশের চূড়ান্ত মর্যাদা পেতে হলে আরো স্থিতিশীলভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন করতে হবে এবং তা ধরে রাখতে হবে।

বর্তমান সরকার প্রায় ১১ বছর ধারাবাহিকভাবে দেশ পরিচালনা করছে। এই সময়ের মধ্যে আমাদের যে অর্থনৈতিক অর্জন তা হয়নি। এ দিকটি বিবেচনায় রেখে চলতি অর্থবছরের জন্য ৮ দশমিক ২ শতাংশ হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থনীতিবিদদের অনেকেই মনে করছেন, চলতি অর্থবছরে যদি ৮ দশমিক ২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হয় তাহলে আগামী অর্থবছরে এই প্রবৃদ্ধির হার সাড়ে ৮ শতাংশ এমনকি পৌনে নয় শতাংশও অর্জিত হতে পারে।

আমাদের দেশের অর্থনীতিতে একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধি কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় বৃদ্ধি না পাওয়া। গত কয়েক বছর ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ ২২ শতাংশে ঘুরপাক খাচ্ছে। অনেকেই বলেন, ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ একই স্থানে স্থবির হয়ে আছে। এটা মোটেও ঠিক নয়। কারণ অর্থনীতির আকার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিনিয়োগও বাড়ছে। তবে আমরা যে হারে বিনিয়োগ বৃদ্ধি চাচ্ছি, সেভাবে বিনিয়োগ বাড়ছে না।

সরকারি খাতে বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বাড়ছে। কিন্তু সরকারি খাতে বিনিয়োগ বাড়লে তা প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে তেমন কোনো অবদান রাখতে পারে না। যেমন পদ্মা সেতু প্রকল্প সরকারি খাতের একটি মেগা প্রকল্প। এই প্রকল্প বাস্তবায়নে ৩০

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৪ই জুন ২০১৯ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেটোত্তর সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা করেন-পিআইডি

বিস্ময়কর। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশ গড়ে সাড়ে ৬ শতাংশ হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। বিশ্বের খুব কম দেশই এত উচ্চ মাত্রায় জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন আগের যে-কোনো সময়ের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী ও টেকসই। ২০০৭-২০০৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্ট অর্থনৈতিক মন্দার কারণে বিশ্বব্যাপী ভয়াবহ অর্থনৈতিক মন্দায় বাংলাদেশ বিস্ময়করভাবে সেই মন্দার প্রভাবমুক্ত থাকতে পেরেছিল। উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য বাংলাদেশ এখন 'উন্নয়নের রোল মডেল'। গত অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল ৭ দশমিক ৮০ শতাংশ। অর্থমন্ত্রী বলেন, চলতি অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করা সম্ভব হবে। তিনি আরো বলেন, জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার হবে ৮ দশমিক ২ শতাংশ। এটা বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশের জন্য অবশ্যই গর্বের ব্যাপার। এমনকি উন্নয়ন সহযোগীরাও বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি নিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেছে। তারা বলেছে, এ বছর বাংলাদেশ এবং ভারত সবচেয়ে বেশি হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে। উভয় দেশের প্রবৃদ্ধি হবে ৭ দশমিক ৩ শতাংশ। বাংলাদেশ যদি ৮ দশমিক ২ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করে তাহলে সেটা হবে এক অনন্য রেকর্ড। কারণ স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে কখনোই ৮ শতাংশ বা তার বেশি হারে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হাজার কোটি টাকারও বেশি ব্যয় হচ্ছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে এখানে সর্বোচ্চ প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান হতে পারে প্রায় হাজার মানুষের। কিন্তু এই প্রকল্প বাস্তবায়নের পর দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় অঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জোয়ার শুরু হবে। প্রচুর শিল্পকারখানা গড়ে উঠবে, যেগুলোতে কোটি কোটি মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। দেশের বিভিন্ন স্থানে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল বাস্তবায়িত হচ্ছে। এগুলো সম্পন্ন হলে দেশের অর্থনীতিতে প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি হবে। আগামী ৫ বছরে সরকার দেশের অভ্যন্তরে ১ কোটি ২০ লাখ মানুষের নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে বদ্ধপরিকর। অর্থমন্ত্রী তার বাজেট বক্তৃতায় বলেন, আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে ৩ কোটি মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বেকার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হবে। এজন্য বাজেট ১০০ কোটি টাকা বিশেষ ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য এই অর্থ ব্যয় করা হবে। কর্মসংস্থান শুধু সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি প্রদানের মাধ্যমে করা হবে না। বরং ছোটো ছোটো শিল্পকারখানা গড়ে তোলার মাধ্যমে মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়া হবে। এলক্ষ্যে বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে। যেসব তরুণ-তরুণী উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদের তৈরি করতে চান তাদের জন্য স্টার্ট আপের জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার জন্য বাজেটে গবেষণার

জন্য ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। চাকরিজীবী নয়, সরকার উদ্যোক্তা তৈরির ওপর জোর দিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আমরা শুধু চাকরি দিয়ে কর্মসংস্থান করতে চাই না। মানুষ যাতে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পায় সেই অবস্থা সৃষ্টি করতে চাই। এটা সত্যি, যে-কোনো দেশই শুধু সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি দিয়ে বেকার সমস্যা সমাধান করতে পারেনি। কর্মসংস্থানের জন্য উদ্যোক্তা শ্রেণি গড়ে তুলতে হবে। সরকার সেই ব্যবস্থাই করছে। বাজেটে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য নানা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কয়েক বছর ধরে কৃষি ও পল্লি ঋণ নামে এক বিশেষ ধরনের ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে– পল্লি এলাকায় কৃষিনির্ভর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যোগ গড়ে তোলা। অনেকেই ব্যাংক থেকে তুলনামূলক স্বল্প সুদে এই ঋণ নিয়ে সফলভাবে ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তুলে আত্মনির্ভরশীল হচ্ছেন।

চিত্র-২

পরিচালন ও উন্নয়ন বাজেট : ২০১৯-২০

(৫,২৩,১৯০ কোটি টাকা)

সম্পদের ব্যবহার

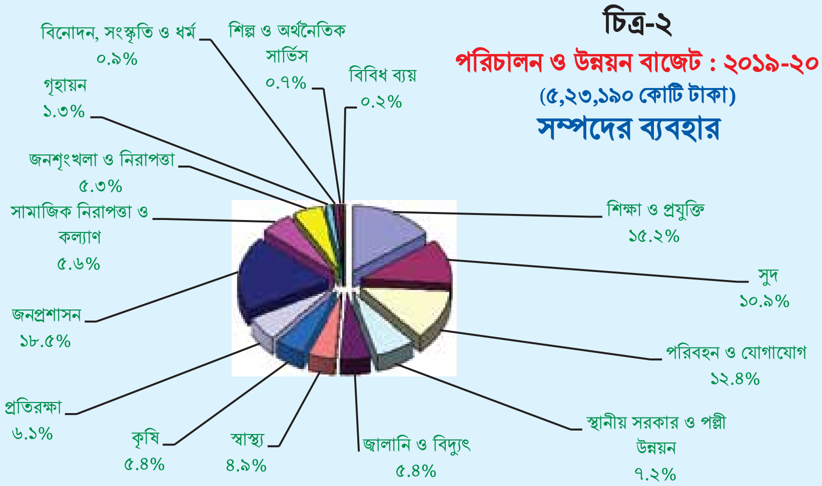

খাতভিত্তিক সম্পদ বিভাজন (ভর্তুকি ও প্রণোদনা এবং পেনশনসহ)

বাংলাদেশের উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য বিদেশি উদ্যোক্তাদের মাঝেও আগ্রহ বাড়ছে। বাংলাদেশের স্থিতিশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিদেশি উদ্যোক্তারা এখানে বিনিয়োগের জন্য আগ্রহী। দক্ষিণ এশিয়ার কোনো কোনো দেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং শ্রমিকের মজুরি অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে অনেকেই তাদের প্রতিষ্ঠিত শিল্পকারখানা অন্য দেশে স্থানান্তরের চিন্তাভাবনা করেছে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ তাদের প্রথম পছন্দ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ইউনাইটেড নেশনস কনফারেন্স অন ট্রেড ডেভেলপমেন্ট (আঙ্কটাড)-এর সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ আহরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার সবার শীর্ষে রয়েছে। ২০১৮ সালে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার ৩৬০ কোটি মার্কিন ডলার করে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ আহরণ করতে পেরেছে। গত বছর স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে বিদেশি সরাসরি বিনিয়োগ বেড়েছে ১৫ শতাংশ। এসব দেশে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ২ হাজার ৪০০ কোটি মার্কিন ডলার। বাংলাদেশ আগের বছরের তুলনায় ৬৮ শতাংশ সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ বেড়েছে। মিয়ানমার বাংলাদেশের সম পরিমাণ বিনিয়োগ আহরণ করলেও তাদের বিনিয়োগের পরিমাণ আগের বছরের তুলনায় ১৮ দশমিক ১ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। আগামীতে বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ আহরণের চমৎকার সুযোগ সৃষ্টি হবে বলেই অর্থনীতিবিদরা মনে করেন।

একইভাবে বাংলাদেশের রেমিটেন্স আয় গত বছর উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। ২০১৮ সালে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে রেমিটেন্স আয় দাঁড়িয়েছে ৫২ হাজার ৯০০ কোটি মার্কিন ডলার। এটা আগের বছরের তুলনায় ৯ দশমিক ৬ শতাংশ বেশি। উচ্চ আয়ের দেশগুলো রেমিটেন্স লাভ করেছে ৬৮ হাজার ৯০০ কোটি মার্কিন ডলার। বাংলাদেশ সাধারণত মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোতে জনশক্তি রপ্তানি করে থাকে। সেসব দেশে বর্তমানে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিরাজ করছে। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশ গত বছর রেকর্ড পরিমাণ ১ হাজার ৬৪২ কোটি মার্কিন ডলার রেমিটেন্স আয় করেছে। ইতঃপূর্বে ২০১৫ সালে বাংলাদেশ ১ হাজার ৫০০ কোটি মার্কিন ডলার আয় করেছিল জনশক্তি রপ্তানি করে। আগামীতে জনশক্তি রপ্তানি আরো বাড়নোর নানা উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। বিশেষ করে যারা বিদেশে যাবে, তাদের উপযুক্ত এবং কার্যকর প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জনশক্তি রপ্তানি খাত এমনই এক অর্থনৈতিক খাত যেটা একইসঙ্গে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে। বাংলাদেশের প্রায় ১ কোটি মানুষ বিদেশে কর্মসংস্থান করছে।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে রপ্তানি বাবদ ৪ হাজার ৫৩ কোটি ডলার আয় হয়েছে– এটা একটি রেকর্ড। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে শিক্ষার হার বেড়েছে। বাজেটে বরাবরের মতোই শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ ব্যয় বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ২০০৮-২০০৯ অর্থবছর থেকে শুরু করে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর সময়ের মধ্যে ২০১১-২০১২ অর্থবছরে বাজেট বাস্তবায়ন হয়েছিল ৯৩ দশমিক ২ শতাংশ। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে বাজেট বাস্তবায়নের হার ছিল ৯০ দশমিক ৮ শতাংশ। বর্ণিত সময়ের মধ্যে আর কোনো বছর বাজেট বাস্তবায়ন ৯০ শতাংশ পেরুতে পারেনি। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বাজেট বাস্তবায়নের হার ছিল ৭৬ দশমিক ১ শতাংশ। বাজেট বাস্তবায়নের এই আপাত ধীর গতি নিয়ে অনেকেই সমালোচনা করছেন। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, প্রতিবছরই বাজেটের আকার বড়ো হচ্ছে। অধিক সংখ্যক প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। বর্তমানে সরকার চেষ্টা করছে কীভাবে বাজেট বাস্তবায়ন আরো দ্রুততর করা যায়। বিশেষ করে প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ দ্রুত ছাড়করণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এতে বাজেট বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। একইসঙ্গে অর্থবছরের শুরুতেই প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু করা হবে।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেটের অন্যতম আলোচিত বিষয় হচ্ছে অপ্রদর্শিত অর্থ সাদাকরণের সুযোগ। কালো টাকা এবং অপ্রদর্শিত অর্থ– এই দুটি শব্দের মধ্যে কিছুটা হলেও ভিন্নতা আছে। যে অর্থ অবৈধভাবে উপার্জিত হয় এবং দেশের কর নেটওয়ার্কের বাইরে থাকে তাকে 'কালো টাকা' বলা হয়। অন্যদিকে বৈধভাবে উপার্জিত কিন্তু কর নেটওয়ার্কের বাইরে থাকে তাকে 'অপ্রদর্শিত অর্থ' বলা হয়। সরকার কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দিচ্ছেন না। অপ্রদর্শিত অর্থ সাদা করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে মাত্র। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর এ পর্যন্ত মোট ১৬ বার অপ্রদর্শিত অর্থ সাদা করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, অপ্রদর্শিত অর্থ যাতে দেশের বাইরে পাচার হয়ে না যায় সেজন্যই সাদা করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। অর্থমন্ত্রী বলেন, অপ্রদর্শিত অর্থ সাদা করার সুযোগ

২০২৪ সাল পর্যন্ত বহাল থাকবে। এই সময়ের মধ্যে কালো টাকা এবং অপ্রদর্শিত অর্থ সৃষ্টির উৎস বন্ধ করার উদ্যোগ নিতে হবে। কারণ কালো টাকা এবং অপ্রদর্শিত অর্থবছরের পর বছর সাদা করার সুযোগ দেওয়া যায় না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদে বাজেট আলোচনায় বলেন, ‘অনেক সময় মানুষের হাতে কিছু অপ্রদর্শিত অর্থ আসে, যা কোনো কাজে লাগানো যায় না। সুযোগ দেওয়া হলে এই টাকা অর্থনীতির মূলধারায় চলে আসবে। মূলত সে কারণেই অপ্রদর্শিত অর্থ সাদা করার সুযোগটা দেওয়া হচ্ছে’।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট মানবিক বোধসম্পন্নও বটে। কৃষির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। কৃষি উপকরণের ওপর কর হার কমানো হয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো শস্য বিমা চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শস্য বিমা চালু হলে কৃষক নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে তাদের উৎপাদিত ফসল সুরক্ষা করতে পারবে।

বর্তমান সরকারের নির্বাচনি অঙ্গীকার হচ্ছে শহরের সুবিধাকে গ্রামে নিয়ে যাওয়া। বাজেটে এলক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য নানাধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বাজেটে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা আরো ২৫ শতাংশ বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। সামাজিক সুরক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর চলতি অর্থবছর থেকে বেসরকারি বিদ্যালয়কে এমপিওভুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেটের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে– এতে প্রথমবারের মতো সার্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা চালুর কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ আগে শুধু সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা পেনশন পেতেন। এখন থেকে বেসরকারি খাতের প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত ব্যক্তিগণও পেনশনের আওতায় আসবেন।

ব্যাংকিং খাতকে সচল করার জন্য অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট ভাষণে বেশ কিছু কথা বলেন। তিনি এই খাতের সংস্কারের জন্য কিছু পদক্ষেপ নেবেন বলে জানান। বিশেষ করে খেলাপি ঋণ যাতে আর না বাড়ে সেই ব্যবস্থা নিবেন। ইতোমধ্যেই খেলাপি ঋণ কমানোর জন্য নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ক'দিন আগে অর্থমন্ত্রী জাতীয় সংসদে ৫ কোটি টাকা ও তদূর্ধ্ব অঙ্কের ঋণ খেলাপি ৩০০ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রকাশ করেছেন। জাতীয় সংসদে ৩০শে জুন বাজেট পাসের দিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, অর্থমন্ত্রী খেলাপি ঋণ কমাতে যে উদ্যোগ নিয়েছেন তা অত্যন্ত সময়োপযোগী। ব্যাংক ঋণের সুদের হার সিঙ্গেল ডিজিটে রাখতে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এটি করা গেলে দেশের শিল্প ও ব্যবসা খাতকে সক্ষম করে গড়ে তোলা যাবে। উচ্চ সুদ হার থাকলে শিল্প খাত বিকশিত হবে না। তিনি আরো বলেন, পঁচাত্তর সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর অবৈধভাবে সামরিক স্বৈরশাসকরা ক্ষমতা দখল করে। এরপর দল গঠন করতে গিয়ে কিছু লোককে অবৈধভাবে সুযোগ-সুবিধা পাইয়ে দিতে ব্যাংক থেকে অকাতরে ঋণ দেওয়া হয় এবং ঋণ শোধ না করার সংস্কৃতি চালু হয়। এই অবস্থা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতেই হবে।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের প্রস্তাবিত মূল বাজেট চূড়ান্তভাবে জাতীয় সংসদে অনুমোদনের সময় এতে সামান্য কিছু সংশোধনী আনা হয়। এই সংশোধনীগুলো জনস্বার্থ বিবেচনা করেই করা হয়েছে। যেমন, মূল্য সংযোজন করের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কথা বিবেচনা করে তাঁতশিল্পে ব্যবহৃত সুতা শিল্পের ওপর ৫ শতাংশ ভ্যাট পদ্ধতি প্রত্যাহার করা হয়েছে। এখন প্রতি কেজি সুতায় কর দিতে হবে ৪ টাকা করে।

চলতি অর্থবছরের বাজেট জাতীয় সংসদে উপস্থাপন, পাস হওয়া এবং বাজেটোত্তর সাংবাদিক সম্মেলন সব মিলিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এক অনন্য রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। আমরা এত দিন দেখেছি, অর্থমন্ত্রী জাতীয় সংসদে বাজেট উপস্থাপন করেন। বাজেট উপস্থাপন পরবর্তী সময়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। কিন্তু এবারের বাজেট উপস্থাপন এবং সাংবাদিক সম্মেলনের ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও ব্যতিক্রম ঘটেছে। জাতীয় সংসদে বাজেট উপস্থাপনের সময় অর্থমন্ত্রী অসুস্থ থাকায় তিনি পুরো বাজেট পেশ করতে পারেননি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অর্থমন্ত্রীর পক্ষ থেকে জাতীয় সংসদে বাজেটের অবশিষ্ট অংশ পাঠ করে শোনান। এছাড়া বাজেটোত্তর সাংবাদিক সম্মেলনেও প্রধানমন্ত্রী সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবার দেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে আর কোনো প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদে অর্থমন্ত্রীর পক্ষে বাজেট বক্তৃতা করেননি এবং বাজেটোত্তর সাংবাদিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেননি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুধু একজন দক্ষ রাজনীতিবিদ নন, তিনি যে অর্থনীতি বিষয়ে অত্যন্ত প্রাজ্ঞ এবং পরিণত একজন মানুষ তার প্রমাণ পাওয়া গেছে সাংবাদিক সম্মেলনে। প্রধানমন্ত্রী বারবারই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা বলেছেন। আগামীতে বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করানোই যে বর্তমান সরকারের প্রধান লক্ষ্য তাঁর কথায় বারবার তাই প্রতিধ্বনি হয়েছে।

বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশের জন্য বাজেট প্রণয়ন করা সবসময়ই বেশ কঠিন। কারণ বাজেটের মাধ্যমে সবাইকে খুশি করা যায় না। বর্তমান বাজেট নিয়েও নানামুখী সমালোচনা করেছেন কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলতে হবে অর্থমন্ত্রী একটি সময়োপযোগী বাজেট প্রণয়ন করেছেন। এই বাজেট সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিশেষ সহায়ক হবে বলে আশা করেন অর্থনীতিবিদগণ।

লেখক: বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেডের অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল ম্যানেজার ও অর্থনীতি বিষয়ক কলাম লেখক

তাজউদ্দীন আহমদঃ জন্মদিনের শ্রদ্ধাঞ্জলি

খালেক বিন জয়েনউদদীন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্থপতি এবং তাঁর ও এ অঞ্চলের নির্যাতিত-নিপীড়িত জনগণের সুদীর্ঘ সংগ্রাম ও আন্দোলনের ফলে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে ১৯৭১ সালে। এই একাত্তর বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বছর। এই একাত্তরে স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে পাকিস্তান হানাদারবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধই মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধ মাত্র ন'মাসেই চূড়ান্ত পরিণতি আনে। পাকিস্তান হানাদারবাহিনী আমাদের কাছে পরাস্ত হয় আত্মসমর্পণের মাধ্যমে। স্বাধীনতা যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্বের অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব এবং বঙ্গবন্ধুর যোগ্য রাজনৈতিক উত্তরসূরি তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ক্যাপটেন এম মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামারুজ্জামান। একাত্তরে যাঁদের যোগ্য নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষা সফল হয়েছিল।

তেইশে জুলাই মুক্তিযুদ্ধের উজ্জ্বল নক্ষত্র তাজউদ্দীন আহমদের ৯৫তম জন্মদিন। জন্মদিনের এই শুভক্ষণে আমরা তাঁকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। তিনিই বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের বিপ্লবী সরকার গঠন করেন, যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং ভারতসহ বিশ্বের স্বাধীনতাকামী মানুষের সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত করেন। তাজউদ্দীন আহমদ ছিলেন বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহচরদের মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশ ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে তিনি কালের বরপুত্র ও কর্মবীর এবং সিপাহসালার।

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস কারোরই অজানা নয়। সাতচল্লিশে আমরা একবার পাকিস্তানি স্বাধীনতা লাভ করেছিলাম। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দ্বিজাতিতত্ত্বের সেই স্বাধীনতা পূর্ব বাংলার মানুষকে মুক্তি দেয়নি। মূলত পাকিস্তানিরা এ অঞ্চলে একটি উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। ফলে বাঙালি '৪৭ সাল থেকে নিগৃহীত হতে থাকে। শোষণ নিপীড়ন চলে। পাহাড় সম বৈষম্য সৃষ্টি হয়। পূর্ব পাকিস্তান তখন পরিণত হয় পশ্চিম পাকিস্তানিদের অর্থ উপার্জনের কেন্দ্র হিসেবে। শুধু তাই নয়, তারা মাতৃভাষার ওপর আক্রমণ করে। পূর্ব বাংলা হয়ে যায় পূর্ব পাকিস্তান। শাসন ক্ষমতার শুরু থেকেই অনৈতিকভাবে চেপে বসে পশ্চিম পাকিস্তানি তথা পাঞ্জাবি জেনারেলরা।

বাঙালির এহেন দুর্দিনে প্রতিষ্ঠিত হয় সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী, শামসুল হক ও তরুণ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে একটি রাজনৈতিক দল। ১৯৬৪ সালে দলের কাউন্সিলে শেখ মুজিবুর রহমান সভাপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৬৬ সালের কাউন্সিলেও তাই। এ সময় বাঙালির নব জাগরণে নেতৃত্ব দেন শেখ মুজিব ও তাঁর সহচরেরা। ছেষট্টির ৬ দফা দাবি, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় এবং একাত্তরের প্রথম পর্বে অসহযোগ আন্দোলনের একমাত্র নেতা ছিলেন বঙ্গবন্ধু। কিন্তু বাঙালির দুর্ভাগ্য ভোটে জিতেও ক্ষমতায় বসতে পারেনি বঙ্গবন্ধুর দল। উপরন্তু পাকিস্তানি সামরিক জান্তারা আলোচনার নামে কালক্ষেপণ করে ২৫শে মার্চ রাতে বাঙালির ওপর হত্যাযজ্ঞ চালায়। আর বঙ্গবন্ধুও তাদের হাতে বন্দি হওয়ার পূর্বে ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং দলীয় নেতৃবর্গ বিশেষ করে তাজউদ্দীন আহমদকে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দিয়ে যান। যার ফলে তাজউদ্দীন আহমদ এবং দলীয় নেতৃবর্গ ভারতে গিয়ে প্রবাসী সরকার গঠন করেন এবং দলকে সুসংগঠিত করেন। ১০ই এপ্রিল তাঁর নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়। তিনি প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপরাষ্ট্রপতি (রাষ্ট্রপতির অবর্তমানে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি) নির্বাচিত হন। ১৭ই এপ্রিল মুজিব নগরে তাঁর সরকার অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রথম গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার আনুষ্ঠানিক শপথ নেন। অবশ্য এর পূর্বে ৩০শে মার্চ ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্তরক্ষী প্রধান নোলক মজুমদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তাঁর প্রিন্সিপাল এইড ব্যারিস্টার আমির-উল-ইসলামকে নিয়ে। ৩রা এপ্রিল দেখা করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে। এই সাক্ষাৎকারটি ছিল ঐতিহাসিক। তিনি ইন্দিরা গান্ধীকে বলেন: 'আমরা গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করছি। আমরা স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছি। ভারত আমাদের বন্ধুরাষ্ট্র। আমরা সর্বপ্রকার সহযোগিতা চাই। মুক্তিবাহিনীকে প্রশিক্ষণ, শরণার্থীদের আশ্রয়, আহার, অস্ত্র সরবরাহ এবং বিশ্বে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও যুদ্ধের সকল প্রচারণার জন্য সহযোগিতা কামনা করি'। ইন্দিরা গান্ধী তাজউদ্দীন আহমদের সকল দাবিই পূরণ করেছিলেন।

এরপর তিনি মুক্তিযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সর্বদলীয় রাজনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদ, মন্ত্রিপরিষদ, প্রধান সেনাপতি নিয়োগ, সেক্টর গঠন, অধিনায়ক নিযুক্ত, প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রকে ৫০ কিলোওয়াটে উন্নীতকরণ এবং বিশেষ দায়িত্বে রাজনৈতিক নেতৃবর্গ ও যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ করেন। একটি নতুন রাষ্ট্রের যুদ্ধরত পুরো টিম নিয়ে তাজউদ্দীন আহমদ রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। দুটি পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন আমাদের বিপক্ষে ছিল। আমাদের সহায় ছিল কেবল রাশিয়া ও বিশ্বের স্বাধীনতাকামী মানুষ।

তেসরা ডিসেম্বর পাকিস্তানিরা ভারতের পশ্চিম সীমান্তে আক্রমণ করলে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ত্বরান্বিত হয়। ভুটান-ভারত আমাদের স্বীকৃতি দেয়। পূর্বাঞ্চলে পাকিস্তানিরা আমাদের যুক্ত কমান্ড অর্থাৎ ভারত-বাংলাদেশ যুক্ত কমান্ডের প্রধান অরোরার কাছে দিনের বেলা প্রকাশ্যে আত্মসমর্পণ করে। তাজউদ্দীন আহমদের সরকার দেশের মাটিতে কলকাতা থেকে ফিরে আসেন ২২শে ডিসেম্বর। তাঁর প্রজ্ঞা, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও দক্ষতার কারণে বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়। দলীয় শত্রুদের তিনি কৌশলে পরাস্ত করেন। মোশতাকের মার্কিনি যোগাযোগ তিনি আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেন। একাত্তরে তাঁর ভূমিকা, অবদান ও অর্জনকে কোনো বাঙালিই ভুলতে পারবে না। তিনি বঙ্গবন্ধুর প্রেরণাকে প্রবাহিত করেছিলেন জীবনের সকল কর্মকাণ্ডে।

১০ই জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর সাথে তাজউদ্দীন আহমদ

তাজউদ্দীন আহমদ ছিলেন একজন সাদাসিধে মানুষ। একাত্তরে তিনি একটি গরিব রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী। তাঁর অফিসের একটি কক্ষের মেঝেতে তিনি রাত কাটাতেন। কক্ষে কোনো খাট, ফ্যান ও পিয়ন ছিল না। একটি প্যান্ট ও শার্ট ছিল পরিধানে। এগুলো তিনি নিজে ধুয়ে পরতেন। পরিবার-পরিজন কলকাতায় থাকা সত্ত্বেও কোনোদিন তাদের বাসায় যাননি। কত কষ্ট ও শ্রমে তিনি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন। আর বঙ্গবন্ধুর খুনিদের হাতেই জেলখানায় একই কারণে প্রাণ হারাতে হয় তাঁকে।

বঙ্গবন্ধুর মতো তাজউদ্দীন আহমদের ঘরে-বাইরে শত্রুর অভাব ছিল না। বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক লীগ গঠনের সময় একটি কুচক্রীমহল তাঁকে কোণঠাসা করে ফেলে। দেশ শত্রুমুক্ত হলে এই মহল তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। তাজউদ্দীন ছিলেন আপোশহীন। তিনি ’৭৩-এর ১৬ই জানুয়ারি বাংলা একাডেমির এক অনুষ্ঠানে এর দাঁতভাঙা জবাব দেন। তিনি বলেন:

> আমি চ্যালেঞ্জ প্রদান করছি, যদি কেউ কোনোদিন প্রমাণ করতে পারেন যে, আমার প্রধানমন্ত্রিত্বকালীন সময়ে ভারতের সঙ্গে কোনো প্রকার গোপনীয় বা প্রকাশ্য চুক্তি করেছি তবে আমি ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলতে প্রস্তুত রয়েছি। ২৩ নভেম্বর ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন যে, ১০ দিনের মধ্যে ভারত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নেতৃত্বে পরিচালিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য প্রদান বন্ধ না করে তবে পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করবে। এই ঘোষণার পর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বিশ্ববাসীর নিকট আবেদন জানান এই হামলা বন্ধ করার জন্য। কিন্তু কিছুই হয়নি এবং ঠিকই দশ দিন পর ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারতের পশ্চিম সীমান্তে আক্রমণ শুরু করে। ফলে ভারতের স্বাধীনতা বিপন্ন হয় এবং আমরাও তখন স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত। তাই উভয়ের স্বাধীনতার চরম শত্রু পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যৌথভাবে কী করে মোকাবেলা করা যায়, তাই নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করি এবং একদিন রাতে সবার অলক্ষ্যে মুজিবনগর থেকে আমি এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব উধাও হয়ে যাই। মিসেস গান্ধীর সঙ্গে রাতে দীর্ঘ আলোচনার পর আমাদের সিদ্ধান্ত ভারতকে জানিয়ে দেই যে, আমরা স্বাধীনতার সম্মিলিত শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করতে প্রস্তুত, তবে তা হবে আমাদের শর্তানুযায়ী। শর্তগুলো হলো: ভারত বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করবে, ভারতীয় সৈন্যবাহিনী বাংলাদেশের সম্মিলিত সৈন্যবাহিনীর সাথে (গণফৌজ ও ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, তৎকালীন ই.পি.আর, আনসার, মুজাহিদ যার সম্মিলিত নাম ছিল মুক্তিবাহিনী) সহায়ক বাহিনী হিসেবে আমাদের সাথে যুদ্ধ করবে– এটাই ছিল ভারতের সাথে বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দের সেই রাতের বৈঠকের কার্যবিবরণী। এটাকে আপনারা যে-কোনো নামে অভিহিত করতে পারেন। আমাদের আপত্তি নেই। এই প্রস্তাবের মূলকপি এখনও বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে জমা রয়েছে।

তাজউদ্দীন আহমদ ১৯২৫ সালের ২৩শে জুলাই গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলাধীন দরদরিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে বিএ অনার্স এবং জেলে থাকাকালীন এলএলবি ডিগ্রি অর্জন করেন। ছাত্রজীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। ছাত্রজীবন থেকেই তাজউদ্দীন আহমদ রাজনীতি ও সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ১৯৪৪ সালে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। ১৯৪৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে কলকাতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে তাজউদ্দীনের প্রথম পরিচয় ঘটে। তখন থেকে তাঁরা একসাথে রাজনীতি করেছেন। তাজউদ্দীন ছিলেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সক্রিয় সদস্য। বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার প্রশ্নে যে কজন নেতা ১৯৪৮ সালে মি. জিন্নাহর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ৩রা নভেম্বর, ১৯৭৫ সালে নির্মমভাবে বঙ্গবন্ধুর খুনিদের হাতে মৃত্যুবরণ করেন।

তাজউদ্দীন আহমদ বাংলাদেশকে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন। তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধুর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ। বঙ্গবন্ধুর দিক নির্দেশনা অনুসরণ করেই দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সাথে মুজিবনগর সরকার ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেন। বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ অভিন্ন। জাতীয় চার নেতা ছিলেন তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি। বঙ্গবন্ধু ছিলেন কেন্দ্রবিন্দু। তাঁকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে সব। রণাঙ্গনে জনপদে তাঁদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ও অবদানের কথা কে মুছে ফেলবে? আমরা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁদের স্মরণ করব। চিরকাল তাঁরা অমর রবে।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

বাজেট ২০১৯-২০২০

সমৃদ্ধির মেগা বাজেট

মোতাহার হোসেন

বাজেট হচ্ছে একটি দেশের পরবর্তী বছরের উন্নয়ন, অগ্রগতি, মানব কল্যাণের, গরিব-দুঃখী মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের রোডম্যাপ বা রূপরেখা। এই বিবেচনায় শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রণীত বিগত দিনের বাজেট এবং বাজেট মূল্যায়নে ও বাস্তবায়নে এই সত্যের প্রতিফলন পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, দেশের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য যে যুদ্ধ, সেটিই সোনালি যুদ্ধ। এই যুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্যই প্রস্তাবিত সর্ববৃহৎ এ বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি বলেন, দারিদ্র্যমুক্ত, উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যেই জনকল্যাণমূলক এ বাজেট। এ বাজেট বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই স্বাধীনতার সুফল ঘরে ঘরে পৌঁছানোই তাঁর সরকারের অন্যতম লক্ষ্য।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৯শে জুন ২০১৯ জাতীয় সংসদে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর আলোচনা করেন-পিআইডি

সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় চার নেতা ও পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্টে নিহতদের স্মরণ করেন প্রধানমন্ত্রী। অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল অসুস্থ থাকায় তাঁর পক্ষে সংবাদ সম্মেলনে প্রস্তাবিত বাজেটের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী।

ব্যাংকের সুদ, আমানত নিয়ে গ্রাহকসহ সাধারণ মানুষের মধ্যে নানারকম মত রয়েছে। আশার কথা, প্রধানমন্ত্রী বাজেট বক্তব্য এবং বাজেট পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনেও এ নিয়ে তাঁর সরকারের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, 'আমরা সবসময় চেষ্টা করেছি, যাতে সুদটা সিঙ্গেল ডিজিটে থাকে'। এজন্য ব্যাংকগুলোকে সুবিধাও দিয়েছি। কিন্তু অনেক বেসরকারি ব্যাংক সেটা মানেনি। এবার বাজেটে নির্দেশনা দেওয়া আছে, এ ব্যাপারে কঠোর অবস্থানে যাওয়া হবে। ব্যাংকগুলোকে নিয়ম মেনে চলতে হবে। ঋণের সুদ যেন ডাবল ডিজিটে না হয়। তাহলে আমাদের বিনিয়োগ বাড়বে। বেশি আর চক্রবৃদ্ধি আকারে সুদ হতে থাকলে মানুষ আর ব্যবসা করতে পারবে না। এদিকটাতে আমরা বিশেষভাবে ব্যবস্থা নিচ্ছি। অনেক আইন আমরা সংশোধন করব, সে ব্যবস্থা নিচ্ছি।

আর একটি বিষয়ে বিগত ১০-১১ বছর ধরেই লক্ষ করা গেছে– বাজেট ঘোষণার পর পর বিভিন্ন সংগঠন, সংস্থা, এনজিও বাজেট প্রতিক্রিয়া দিয়ে এর কঠোর সমালোচনা করবে। এসব সমালোচনা কখনো কখনো অসত্য, কাল্পনিক তথ্য দিয়ে সরাসরি বাজেটের বিরোধিতা আবার কখনো কখনো বাজেট প্রত্যাখ্যান করে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, সাধারণ মানুষ এই বাজেটে খুশি কি-না, বাজেটে তাদের উপকার হচ্ছে কি-না– সেটাই গুরুত্বপূর্ণ।

এবারের বাজেটে সচ্ছল ও উচ্চ আয়ের মানুষকে বেশি সুবিধা দেওয়া হয়েছে এ ধরনের প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে একজন সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তারা কী গবেষণা করেন আমি জানি না। এত সমালোচনা করেও আবার বলবে, আমরা কথা বলতে পারি না। আমার কথা হচ্ছে, সাধারণ মানুষ খুশি কি-না। তারা লাভবান হচ্ছে কি-না, এটাই দেখার বিষয়। আমাদের এগারোতম বাজেট। দেশের ইতিহাসে এটা সবচেয়ে বড়ো বাজেট। এর সুফল সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছাবে। প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, আমি মনে করি আমরা এক্ষেত্রে যথেষ্ট সফল। আগে বিশ্বদরবারে আমাদের ভিক্ষুকের জাত বলত, এখন আর কেউ এটা বলতে পারে না। এটাই বড়ো অর্জন। এমন অর্জন সত্ত্বেও সমালোচনা! যারা সমালোচনা করে, করে যাক। ভালো কিছু বললে গ্রহণ করব, মন্দ কিছু বললে ধর্তব্যে নেব না।

তিনি বলেন, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ১০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি উন্নীত করা সরকারের লক্ষ্য, এসডিজি বাস্তবায়ন ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সামনে রেখে বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে এটাই সর্ববৃহৎ বাজেট জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের সরকারের বিগত দুই মেয়াদে ১০ বছরে যে অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে– তার মাধ্যমে জনগণের মাঝে আমাদের প্রতি আস্থা বেড়েছে। তার প্রতিফলন ঘটেছে গত ৩০শে ডিসেম্বর সাধারণ নির্বাচনে।

দেশের বেকার যুবসমাজের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারের আগাম পরিকল্পনা দরকার। এই লক্ষ্যমাত্রার কথা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে ৩ কোটি যুবকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। সেলক্ষ্যে কাজ করছে সরকার। কৃষি খাতে সরকারের ভরতুকি ও প্রণোদনা অব্যাহত থাকবে জানিয়ে তিনি বলেন, বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন বাড়াতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও প্রণোদনা থাকবে। কৃষি ভরতুকি, ঋণ ও কৃষিপণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রণোদনাও থাকবে।

শহরের আদলে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা সংবলিত পরিকল্পিত গ্রাম গড়ে তোলার কথা। এই বাজেটে, আমার গ্রাম আমার শহর'

জাতীয় বাজেট ২০১৯-২০২০

বাজেট	৪৯তম
বাজেট ঘোষণা	১৩ই জুন ২০১৯
বাজেট ঘোষক	অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল
বাজেট পাস	৩০শে জুন ২০১৯
বাজেট কার্যকর	১লা জুলাই ২০১৯ থেকে
মোট বাজেট	৫,২৩,১৯০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৮.১৩%)
সামগ্রিক আয় (রাজস্ব ও অনুদানসহ)	৩,৮১,৯৭৮ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৩.২৪%, বাজেটের ৭৩.০১%)
রাজস্ব আয়	৩,৭৭,৮১০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৩.০৯%, বাজেটের ৭২.২১%)
বৈদেশিক অনুদান	৪,১৬৮ কোটি টাকা (জিডিপি'র ০.১৪%, বাজেটের ০.৭৯%)
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)	২,০২,৭২১ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৭.০২%; বাজেটের ৩৮.৭৫%)
মোট ব্যয়	৫,২৩,১৯০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৮.১৩%)। ব্যয়ের মধ্যে রয়েছে পরিচালন ব্যয় (আবর্তক ও মূলধন ব্যয়), খাদ্য হিসাব, ঋণ ও অগ্রিম (নিট) এবং উন্নয়ন ব্যয়।
সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদানসহ)	১,৪১,২১২ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৪.৮৯% ও বাজেটের ২৬.৯৯%)
সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত)	১,৪৫,৩৮০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৫.০৪% ও বাজেটের ২৭.৭৯%)
অর্থসংস্থান	১,৪১,২১২ কোটি টাকা
বৈদেশিক ঋণ (নিট)	৬৩,৮৪৮ কোটি টাকা (জিডিপি'র ২.২১% ও বাজেটের ১২.২০ %)
অভ্যন্তরীণ ঋণ	৭৭,৩৬৩ কোটি টাকা (জিডিপি'র ২.৬৮% ও বাজেটের ১৪.৭৯%)
মোট জিডিপি	২৮,৮৫,৮৭২ কোটি টাকা
অনুমিত বিষয়	জিডিপি প্রবৃদ্ধি: ৮.২%
মূল্যস্ফীতি	৫.৫%

বাস্তবায়নে ৬৬ হাজার ২৩৪ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। বাজেটে 'আমার গ্রাম আমার শহর' প্রসঙ্গে বিভিন্ন দিক তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গ্রাম যেন উন্নত হয়, সেখানকার মানুষ যেন শহরের মানুষের সুবিধা পায়, সেজন্য আমাদের নির্বাচনি ইশতাহার 'আমার গ্রাম আমার শহর' কর্মসূচির আলোকে পল্লি এলাকায় অবকাঠামো উন্নয়নে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে দেশজুড়ে ৫ হাজার ৫০০ কিলোমিটার নতুন সড়ক এবং ৩০ হাজার ৫০০ মিটার ব্রিজ নির্মাণ করা হবে। সেজন্য এ খাতে আগামী অর্থবছরে ৬৬ হাজার ২৩৪ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

অবশ্য এবারের বাজেটে শিক্ষক সমাজের দাবিরও প্রতিফলন ঘটেছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির কার্যক্রম শুরু হয়েছে। অনুরূপ স্বাস্থ্য খাতেরও বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এবার স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। স্বাস্থ্য উন্নয়নের মাধ্যমে চিকিৎসা ও অন্যান্য সামাজিক সুবিধা নিশ্চিতকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ৮টি মেডিক্যাল কলেজে নিউক্লিয়ার মেডিসিন ইনস্টিটিউট খোলা হবে। দেশের প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য কাজ চলছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০৪১ সালের মধ্যে ৬০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা আমরা অর্জন করব, সেলক্ষ্যে কাজ করছে সরকার। 'সমৃদ্ধ আগামীর পথযাত্রায় বাংলাদেশ: সময় এখন আমাদের, সময় এখন বাংলাদেশের' শীর্ষক এবারের বাজেটের আকার ৫ লাখ ২৩ হাজার ১৯০ কোটি টাকা। এ বাজেটে পরিচালনসহ অন্যান্য খাতে মোট বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৩ লাখ ২০ হাজার ৪৬৯ কোটি টাকা। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২ লাখ ২ হাজার ৭২১ কোটি টাকা। বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাশিত সোনার বাংলা, ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্ত, বৈষম্যহীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নিজেও গত দুই মেয়াদে ক্ষমতায় থাকাকালে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত স্বপ্ন জাতির অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করে সফলতা অর্জন করেছেন। এ কারণে আজ বিশ্বে 'বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেলে' পরিণত হয়েছে। একইসঙ্গে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রীর যে অভিপ্রায় বা স্বপ্ন তা পূর্ণ হবে। এজন্য আমাদের নৈতিক দায়িত্ব হবে– যে যার অবস্থান থেকে প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায় বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা দেওয়া।

লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট

বাজেটে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা ভাতা দুই হাজার টাকা বেড়েছে

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেটে দেশের সূর্যসন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা ভাতা দুই হাজার টাকা বেড়েছে। বর্তমানে তাঁরা মাসিক সম্মানী ভাতা হিসেবে নগদ ১০ হাজার টাকা পান। এ সম্মানী ভাতা ছাড়াও তাঁরা অন্য যেসব সুবিধা পান তা বহাল রাখা হয়েছে বাজেটে। এতে সরকারের অতিরিক্ত ব্যয় হবে ৪৮০ কোটি টাকা। অর্থ মন্ত্রণালয় সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। সূত্র জানায়, দেশে প্রায় দুই লাখ মুক্তিযোদ্ধা। তাঁরা মাসিক সম্মানী ভাতা হিসাবে নগদ ১০ হাজার টাকা করে পান। মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন সংগঠন মাসিক এ সম্মানী ভাতা ৩৫ হাজার টাকা করার দাবি জানিয়ে আসছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে মাসিক সম্মানী ভাতা দুই হাজার টাকা বাড়িয়ে ১২ হাজার টাকা করা হয়েছে। এর বাইরে মুক্তিযোদ্ধারা বর্তমানে দুই ঈদে দুটি উৎসব ভাতা, বিজয় দিবস ভাতা ও নববর্ষ ভাতা পাচ্ছেন। মুক্তিযোদ্ধারা প্রতিবছর বিজয় দিবস ভাতা বাবদ এককালীন পাঁচ হাজার টাকা করে পাচ্ছেন। এতে সরকারের বরাদ্দ রয়েছে ৬৫ কোটি টাকা। আর নববর্ষ ভাতা পাচ্ছেন দুই হাজার টাকা করে। এজন্য সরকারের বরাদ্দ রয়েছে ৪০ কোটি টাকা। দুই ঈদে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য দুটি উৎসব ভাতায় সরকারের বরাদ্দ আছে ৪০০ কোটি টাকা। এসব সুবিধা বহালসহ দুই হাজার টাকা ভাতা বাড়ানোর ফলে চলতি অর্থবছরের নতুন বাজেটে সরকারের অতিরিক্ত ব্যয় হবে ৪৮০ কোটি টাকা। গত অর্থবছরে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য তিন হাজার ৮০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। সে হিসাবে বরাদ্দের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে চার হাজার ২৮০ কোটি টাকা।

প্রতিবেদন: মোহাম্মদ খালিদ হোসেন

শতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রেহানা শাহনাজ

পহেলা জুলাই অগ্রযাত্রা শুরু করে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। পিছিয়ে পড়া মুসলিম সমাজের সঠিক অগ্রগতির লক্ষ্যে ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এ বছর ৯৮ বছরে পদার্পণ করল বিশ্ববিদ্যালয়টি। আন্দোলন, সংগ্রাম আর বর্ণিল ইতিহাস নিয়ে এগিয়ে চলেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাঙালির সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জাগরণের প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রেখেছিল ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং ১৯৯০ সালের স্বৈরাচার-পতনসহ নানা আন্দোলন নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে এই প্রতিষ্ঠানটি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ঢাকাস্থ শাহবাগে অবস্থিত বাংলাদেশের একটি স্বায়ত্তশাসিত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। যা ইতোমধ্যে গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। তদানীন্তন ব্রিটিশ ভারতে অকৃত্রিম শিক্ষাব্যবস্থা অনুসরণে এটি স্থাপিত হয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ অবদান ছিল। বাংলাদেশের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে এশিয়া উইকের পক্ষ থেকে শীর্ষ একশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় জায়গা করে নেয়। তারমধ্যে ঢাকা বিশ্বদ্যিালয় ৬৪তম। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৩৮,০০০ জন এবং শিক্ষক রয়েছে ১,৮০৫ জন। এর আয়তন ২৬০ একর। (ইনস্টিটিউট অব লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি ব্যতীত) অনুষদ রয়েছে ৫টি যেমন: বিজ্ঞান অনুষদ, কলা অনুষদ, আইন অনুষদ, বাণিজ্য অনুষদ ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ)।

ব্রিটিশ ভারতে তৎকালীন শাসকদের সিদ্ধান্তে পূর্ববঙ্গের মানুষদের দাবির ফসল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। 'ঢাকার স্মৃতি-বিস্মৃতি নগরী' গ্রন্থে ইতিহাসবিদ মুনতাসীর মামুন লিখেছেন– বঙ্গভঙ্গ রদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। যাকে লর্ড লিটন আখ্যা দিয়েছেন 'স্পেলেন্ডিড ইম্পিরিয়াল কমপেনসেশন'। পূর্ববঙ্গে শিক্ষাদীক্ষা, অর্থনীতি সব ক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল। বঙ্গভঙ্গ হওয়ার পর এ অবস্থার খানিকটা পরিবর্তন হয়েছিল, বিশেষ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে।'

তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেন। পূর্বে ভাইসরয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবেদন জানান ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ, নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তাব করেন ব্যারিস্টার আর নাথানের নেতৃত্বে ডি আর কুলচার, নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, নওয়াব সিরাজুল ইসলাম, ঢাকার প্রভাবশালী নাগরিক আনন্দ চন্দ্র রায়, জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ ললিত মোহন চট্টোপাধ্যায়, ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ ডব্লিউ এটি অর্চিবল্ড, ঢাকা মাদ্রাসার তত্ত্বাবধায়ক শামসুল উলামা আবু নসর মুহম্মদ ওয়াহেদ মোহাম্মদ আলী। সৃষ্টির শুরুতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নানা প্রতিকূলতার মুখে পড়ে। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। এর ফলে পূর্ববঙ্গের মানুষ হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ১৯২০ সালে ২৩শে মার্চ গর্ভনর জেনারেল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিল পাসের সম্মতি দেন। এই আইনটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ভিত্তি। এই আইনের বাস্তবায়নের ফলাফল হিসেবে ১৯২১ সালের ১লা জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রা শুরু করে। তিনটি অনুষদ ও ১২টি বিভাগ নিয়ে একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে এর যাত্রা শুরু হয়। ঢাকা কলেজ ও জগন্নাথ কলেজের ডিগ্রি ক্লাসে অধ্যয়নরত ছাত্রদের নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রা শুরু করে। শুধু ছাত্র নয়; শিক্ষক এবং লাইব্রেরির বই ও অন্যান্য উপকরণ দিয়ে এ দুটি কলেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি হলের নামকরণ করা হয়- ঢাকা হল (বর্তমানে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হল) ও জগন্নাথ হল।

কলা, বিজ্ঞান ও আইন অনুষদের অর্ন্তভুক্ত ছিল– সংস্কৃত ও বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, আরবি, ইসলামিক স্টাডিজ, ফারসি, উর্দু, দর্শন, অর্থনীতি ও রাজনীতি, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত এবং আইন।

বর্তমান পরির্বতনশীল বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা গবেষণা, বিজ্ঞান প্রযুক্তিসহ জ্ঞানের সব শাখায় এগিয়ে যাচ্ছে। গবেষণায় এই বিশ্ববিদ্যালয় আলোচনার শীর্ষে থাকা সত্ত্বেও অনেক ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক দাবি করেছেন গবেষণার আরো সুযোগ থাকা উচিত। উপাচার্য ড. মো. আখতারুজ্জামান অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের উন্নত বাংলাদেশ গড়তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

লেখক: কবি ও প্রাবন্ধিক

মানুষের অস্তিত্ব রক্ষায় প্রকৃতি সংরক্ষণের গুরুত্ব

শামস সাইদ

যে-কোনো দিবসেরই একটা তাৎপর্য রয়েছে। সেই তাৎপর্য মানব জীবনে নানা শিক্ষা বহন করে। তাই সাধারণ দিন থেকে একটু আলাদা মর্যাদা দিয়ে বিশেষভাবে আমরা দিবস পালন করার চেষ্টা করি। ২৮শে জুলাই বিশ্বব্যাপী 'বিশ্ব প্রকৃতি সংরক্ষণ দিবস' পালন করে থাকে। পৃথিবীর অন্যদেশগুলোর মতো আমরাও এ দিবসটি পালন করে থাকি। তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ দিবসটি অন্য দিবসগুলোর থেকে গুরুত্বপূর্ণ।

প্রকৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে মানুষের অস্তিত্ব। সেই অস্তিত্ব রক্ষায়ই মানুষ প্রকৃতি সংরক্ষণে সচেষ্ট হয়ে উঠেছেন। পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যাপারে মানুষকে সচেতন করার জন্য আন্তর্জাতিক বন দিবস, বিশ্ব জীববৈচিত্র্য দিবস, আন্তর্জাতিক নেচার সামিট, বাঘ দিবস, পরিবেশ দিবস, ব্যাঙ সংরক্ষণ দিবস, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ দিবস হিসেবে পালন করা হয়। বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন, ধরিত্রী সম্মেলন করা হয়।

প্রত্যেক মানুষ চেষ্টা করেন ভালো থাকতে। তবে ভালো থাকার যত উপাদান-উপকরণ সবই রয়েছে প্রকৃতিতে। জীবগত, মানবগত, আলো, পানি, বাতাস, গাছপালা, পাহাড়, তরুলতা সবই প্রকৃতির দান। এসব আমাদের ভালো থাকতে সহায়তা করে। সবুজ প্রকৃতি না থাকলে মানুষের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যেত। অবারিত ফসলের মাঠ আর বৈচিত্র্যময় বনাঞ্চল, বৃক্ষের সজীবতা, সবুজ-শ্যামল ভূখণ্ড নিয়ে আমাদের বাংলাদেশ। এরকম প্রাকৃতিক পরিবেশে নিবিড় বন্ধনেই গড়ে উঠে মানব সভ্যতা।

দিন দিন মানুষের জীবনযাত্রার মান পরিবর্তন হচ্ছে, সেই সাথে বাড়ছে নানামুখী চাহিদা। তাই বৃক্ষের সজীবতা কিংবা খাল, জলাভূমি বিলিন হয়ে যাচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে এসব লাভজনক বা প্রয়োজন মনে হলেও পরিবেশকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বনাঞ্চল কমে যাওয়ার কারণে হারিয়ে যাচ্ছে অনেক প্রজাতির পাখি ও প্রাণী। তাই প্রকৃতি সংরক্ষণ আমাদের জন্য বড়ো চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইতঃপূর্বে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে যেসব কেস স্ট্যাডি উপস্থাপিত হয়েছে তাতে বাংলাদেশের ক্ষতির বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে।

প্রকৃতি সংরক্ষণ বলতে বুঝায় নৈসর্গিক বস্তুর সংরক্ষণ; যা মানুষের পক্ষে সৃষ্টি সম্ভব নয়। পরিবেশ ও প্রকৃতি সংরক্ষণ ব্যাপক বিশ্লেষণধর্মী। সংক্ষেপে বলা যায়, আমাদের চারপাশে যা কিছু দেখি বা যেসব উপাদান বা বস্তুসম্ভার অবলোকন করি এবং যা প্রকৃতির সঙ্গে জীবজগতের সম্পর্ক ও সহাবস্থানসহ আমাদের ভালোমন্দ ও সুখ-দুঃখের ওপর কর্তৃত্ব করে, তাই আমাদের পরিবেশ। বনভূমি ও বন্য পশুপাখি প্রকৃতির শোভাবর্ধক।

প্রতিবছর শীতকালে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী পাখির আগমন ঘটে। এসব পাখি সমৃদ্ধ করছে এদেশের জীববৈচিত্র্যের ভাণ্ডার। অনিন্দ্য সুন্দর এ পাখিগুলো আমাদের প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। খাদ্য ও আশ্রয়ের সন্ধানে এসব পাখি হাজার হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে আমাদের দেশে আসে। পাখিরা ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, মাটিকে উর্বর করাসহ জলজ পরিবেশকে সুন্দর রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এছাড়াও প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা এবং আমাদের মতো কৃষিভিত্তিক দেশে ফসলের ক্ষতিকর পোকা দমনে উভচর প্রাণী ব্যাঙেরও গুরুত্ব রয়েছে। ব্যাঙ যেমন ক্ষতিকর পোকা দমন করে, সেই সাথে ব্যাঙ থেকে মানুষের উপকারী অনেক ওষুধ আবিষ্কার হচ্ছে। জীববিজ্ঞানীদের মতে, ব্যাঙ ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দিতেও সক্ষম।

আমাদের জাতীয় বন সুন্দরবনকে ইউনেস্কো ১৯৯৭ সালে বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণা করেছে। বলা হয়ে থাকে, 'করলে রক্ষা সবুজ বন, থাকবে পানি, বাঁচবে জীবন'। দেশের মোট আয়তনের মাত্র ১৭ ভাগ বনাঞ্চল। আমাদের বনাঞ্চলগুলো প্রাকৃতিক সম্পদের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রতিটি বনেই রয়েছে বন্যপ্রাণী ও অন্যান্য সম্পদ। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার পাশাপাশি বন ও বনজ সম্পদের ওপর নির্ভর করেই বেঁচে আছে এদেশের কোটি মানুষ। সুন্দরবনের সম্পদের ওপর সরাসরি নির্ভর করে জীবিকানির্বাহ করছে প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ।

বন ও বন্যপ্রাণীর সঙ্গে মানুষের জীবন ও জীবিকার যেমন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে, তেমনি বন রক্ষার সঙ্গে জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ রক্ষাও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বিশ্বব্যাপী নির্বিচারে বনভূমি ধ্বংসের পাশাপাশি শিল্পোন্নত দেশগুলো কর্তৃক অনিয়ন্ত্রিত শিল্পায়নের মাধ্যমে অবাধে কার্বন নিঃসরণের ফলে শুধু জলবায়ু পরিবর্তনই হয়নি, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের বন ও বন্যপ্রাণী হুমকির মুখে পড়েছে। বন হুমকির মুখে পড়ায় বন্যপ্রাণী বিশেষ করে হাতি, বাঘসহ অনেক প্রজাতির প্রাণী বিলুপ্তির হুমকির মুখে পড়ছে। পাশাপাশি শিল্পায়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নতির লক্ষ্যে একের পর এক প্রাকৃতিক বনাঞ্চল উজাড় করায় ক্রমশ বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের ফলে সার্বিকভাবে কৃষি বিশেষ করে ধানসহ পানিনির্ভর কৃষির রোপণ প্রক্রিয়া এবং উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। ফলে প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের জীবন ও জীবিকার ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। সমগ্র বিশ্বের পরিবেশের ধারণাকে একটি জায়গায় নিয়ে এসেছে সেটা হলো টেকসই উন্নয়ন।

এর কারণ ভবন নির্মাণবিধিতে ভবনের চারপাশে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জায়গা ছাড়ার নিয়ম আছে। কিন্তু অনেকে এ নিয়ম মানছেন না। আবার যারা জায়গা ছেড়ে ভবন নির্মাণ করছেন, তারা ফাঁকা জায়গা পাকা করে ফেলছেন। ফলে একটি ভবনের চারপাশের জায়গা পাকা হয়ে যাচ্ছে। এসব পাকা জায়গার ওপর সূর্যরশ্মি পড়ে বি-করণ হয়ে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। একে বলে মিন রেডিয়েন্ট টেম্পারেচার। মিন রেডিয়েন্ট টেম্পারেচারের ফলে ওই এলাকার স্বাভাবিক অবস্থা ব্যাহত হয়। এ কারণে এসব এলাকার ভবনে বিদ্যুতের ব্যবহার বেড়ে যায়। ফলে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে হয়। এই বাড়তি বিদ্যুৎ উৎপাদনের ফলে পরিবেশে আরও বেশি কার্বন নির্গমন হয়। তাই বাড়ির চারপাশের খোলা জায়গা পাকা না করে গাছপালা ও ঘাস লাগানো বাধ্যতামূলক করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও এই আহ্বান জানিয়ে বলেন যে, 'বাড়ির আঙিনায় আপনারা গাছ লাগান। সন্তানদের গাছ লাগাতে উদ্বুদ্ধ করুন'।

বিশ্বব্যাপী প্রকৃতি সংরক্ষণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয় হচ্ছে প্রায় ৭০০ কোটি মানুষ এবং মানুষের ভোগ। পৃথিবীতে এমন কোনো সমস্যা নেই, যার সঙ্গে ক্রমবর্ধমান মানুষের সম্পৃক্ততা নেই। গত ৫০ বছরে পৃথিবীর জনসংখ্যা ৩২০ কোটি থেকে ৭০০ কোটি হয়েছে। প্রকৃতি সংরক্ষণের ব্যাপারে এই বিষয়টিকেও গুরুত্ব দিতে হবে।

২০৫০ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা দাঁড়াবে এক হাজার কোটি বা তারও বেশি। এই সংখ্যা বৃদ্ধির বিশাল প্রভাব পড়বে প্রকৃতির ওপর। জনসংখ্যা প্রতিরোধ করা খুব সহজ না। তবে প্রকৃতিকে রক্ষা করতে হবে ধ্বংসের হাত থেকে। না হয় আমরাই ধ্বংস হয়ে যাব।

পরিবেশ নিয়ে বিশ্বব্যাপী অনেক সচেতন। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো এ বিষয়ে গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করছে। টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে আবহাওয়া পরিবর্তনের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ ভাবা হচ্ছে। ২০২১ ও ২০৪১ সালে আমরা যথাক্রমে মধ্যম ও উন্নত বাংলাদেশে পরিণত হতে হলে বিপুল পরিমাণ এনার্জি রিজার্ভ থাকতে হবে। ২০৩০ সালে আমাদের লক্ষ্য ৩৪ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা। এর একটা বিশাল প্রভাব প্রকৃতি ও পরিবেশের ওপর পড়বে। সেক্ষেত্রে পরিবেশ ও প্রকৃতি রক্ষায় আমাদের আরো বেশি সচেতন হতে হবে। আমরা যদি জলাভূমির দিকে তাকাই, দেখা যাচ্ছে জলাভূমিগুলো দিন দিন বিপন্ন হচ্ছে। জলভূমিতে কেবল মাছ নয়, মাছ ছাড়াও অনেক উপাদান থাকে, যেগুলো পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

হল্যান্ডে আদালত রায় দিয়েছে, ২৫ শতাংশ নয়, ৪০ শতাংশ কার্বন হ্রাস করতে হবে। ২০০ বছর পর পোপ পরিবেশের ব্যাপারে আদেশ জারি করেছেন। আমরা কার্বন উৎপাদন করি না, কিন্তু এর ক্ষতির শিকার হচ্ছি। অনেক সমস্যা আছে যা আন্তর্জাতিকভাবে হস্তক্ষেপ ছাড়া সমাধান করাও সম্ভব না।

প্রকৃতি মানুষের জীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ বা প্রয়োজনীয় তা যখন মানুষ উপলব্ধি করতে পারবে তখন মানুষ প্রকৃতি রক্ষায় আরো বেশি আন্তরিক হয়ে উঠবে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কেন প্রকৃতি সংরক্ষণে এত বেশি সচেতন? প্রকৃতির সাথে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। কেননা বেশিরভাগ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের 'বাস' প্রকৃতির কোলে! এমনকি তাদের জীবন ও জীবিকাও নির্ভর করে প্রকৃতির ওপর। বাংলাদেশে ৪৫ জাতিগোষ্ঠীর আদিবাসী রয়েছে। বিভিন্ন পরিসংখ্যান অনুযায়ী তাদের বর্তমান সংখ্যা আনুমানিক ৩০ লাখ। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের জীবন-জীবিকা, সংস্কৃতি, জীবনপ্রণালি প্রকৃতির সঙ্গে জড়িত। এর বাইরে তদের অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায় না। একটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশুর জন্মের পর প্রকৃতির সঙ্গে তার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। কারণ এই প্রকৃতি থেকেই তাদের ঘরবাড়ি, জ্বালানি, আসবাবপত্র, ঔষধ, খাবার-দাবার সংগ্রহ করতে হয়। বাংলাদেশের চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, সাঁওতাল, খাসি, গারো, পাত্র, ওরাঁও, হাজং, খারিয়া, মুন্ডাসহ আরো অনেক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বাস করে। এর মধ্য দিয়ে তারা প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সংরক্ষণে অবদান রাখছেন। যা অনেকটা নিজ অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য। এই সংগ্রামময় জীবনে প্রকৃতি তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়ায়। তাই পাহাড়ের বুকে তারা আশ্রয় নিয়ে নতুন স্বপ্ন রচনা করে, পাহাড়-গাছপালা, লতাপাতা, পশুপাখি, ঝরণা, ছড়া থেকে শিখে নেয় জীবন ও জীবিকাকে বাঁচিয়ে রাখার কৌশল।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরা পাহাড় পোড়ে না, গাছ কাটে না, জমিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করে না! কৃষিকাজের জন্য তারা পতিত ও অব্যবহৃত ন্যাড়া পাহাড়ে গাছ রোপণ করে, জৈব সার ব্যবহার করে। সারা বিশ্বের মানুষ যখন কোনো না কোনোভাবে প্রাণবৈচিত্র্য হরণ ও প্রকৃতি বিনাশ প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত তখনো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পাহাড়-বন-জঙ্গল প্রকৃতি ও পরিবেশকে সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় করে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। কারণ তারা জানেন এটাই তাদের বাঁচার অবলম্বন। এই জানাটাই প্রকৃতির ওপর তাদের মায়া বাড়িয়ে দিয়েছে। বাড়ছে তাদের সচেতনতা। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের এলাকায় গেলে গাছপালা, গুল্ম ও লতা দেখা যায়। প্রাকৃতিকভাবেই এসব গাছপালা ও গুল্ম জন্মলাভ করে। এসব গাছপালা ও গুল্ম নিধন না করে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরা এগুলোকে সংরক্ষণ করে রেখেছেন তাদের নিজস্ব প্রয়োজনেই! অনেক প্রাণী বিলুপ্ত হচ্ছে খাদ্যাভাবের কারণে। কিন্তু আদিবাসীদের এলাকায় এখনো অনেক প্রাণী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণ রয়েছে। প্রকৃতির সাথে বন্ধুত্ব করেই তাদের জীবন ও জীবিকা আবর্তিত হয়।

আমরাও যখন উপলব্ধি করতে পারব প্রকৃতি আমাদের বাঁচার রসদ সরবরাহ করে তখন প্রকৃতি রক্ষায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের মতো আমরাও আন্তরিক হয়ে উঠব। প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণে জনসচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাবে। সরকারের পাশাপাশি দেশের সাধারণ জনগণকেও একযোগে প্রকৃতি সংরক্ষণে কাজ করতে হবে। বর্তমান সরকার প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কাজ করে যাচ্ছে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং এর উপাদানসমূহের টেকসই ব্যবহারকে গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন ২০১৭ জারি করেছে। নদীদূষণ রোধসহ নদীগুলোর নাব্যতা ফিরিয়ে আনার জন্য সরকার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। শিল্পকারখানার বর্জ্য থেকে নদনদী, জলাভূমি ও জলাধারসমূহ রক্ষায় শিল্পপ্রতিষ্ঠানে তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) স্থাপন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলার লক্ষ্যে নিজস্ব অর্থায়নে ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেছে।

বাংলাদেশের সংবিধানে ১৮(ক) অনুচ্ছেদে বলা আছে 'রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ ও প্রকৃতি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবে'। তাই সংবিধান রক্ষা অঙ্গীকার সবার মাঝে থাকতে হবে।

২০৩০ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ১৫-এর মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বন উজাড় রোধ করার মাধ্যমে মরুকরণ রোধ এবং ভূমিক্ষয় হ্রাসে জোর প্রদান করা হয়েছে।

জীববৈচিত্র্য, কৃষিকাজ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং মানুষের জীবন-জীবিকার সুরক্ষা ও বিকাশে বনভূমিসহ ম্যানগ্রোভ সুন্দরবনকে রক্ষা, খাবার পানির অন্যতম উৎস নদী, খালবিল রক্ষার পাশাপাশি কার্যকর জলবায়ু অভিযোজনের জন্য চাহিদা জোরদার করা হয়েছে।

এ প্রেক্ষাপটে পরিবেশবান্ধব টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, সুন্দরবনসহ সব বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধানের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা অনুসারে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে সদিচ্ছার প্রকাশ ঘটিয়ে বিদ্যমান আইনের কঠোর প্রয়োগ, বিশেষ করে 'বাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩' কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমে সব ধরনের জলাধার দূষণ ও দখল রোধে বর্তমান সরকার নানামুখি কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। সরকারি, বেসরকারি ও বাণিজ্যিকভাবে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিবেশগত ভারসাম্য ও টেকসই উন্নয়নের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য জাতীয় 'সেচ আইন' প্রণয়নসহ সংশ্লিষ্ট আইনি কাঠামোর যথোপযুক্ত সংস্কারের মাধ্যমে সরকার প্রস্তাবিত সংরক্ষণে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। পরিবেশ দূষণ রোধ সংক্রান্ত আইনের পাশাপাশি শিল্পবর্জ্য নির্গমন সংক্রান্ত বিধিমালার কঠোর প্রয়োগ ও শিল্প দূষণ রোধে বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করছে বর্তমান সরকার।

লেখক: প্রাবন্ধিক

খ্যাতির মৌমাছি

জাকির আবু জাফর

যে যায় যাক আমি যাবো না–
যাবো না খ্যাতির কামার্ত কাঙালের ভিড়ে
যেখানে শোভন ছলে আত্মগন্ধের অকাট বিজ্ঞাপন
যেখানে কেবল আত্মচারীর নিতান্ত ভাগাড়
এমন প্রতারিত নকল নায়কের সঙ্গ আমার পোষায় না
খ্যাতির তৃষ্ণায় জল ঢেলে লোভের রাক্ষস তাজা
করার খায়েশ আমার মোটেই নেই
আমি নির্জনতার হাত ধরে বসে থাকি, তার পাঁজর থেকে
ছেঁকে আনি জ্যোতির শরাব
গোপনে গহনে আমার বুকের ভেতর উঠে আসে
একাকিত্বের শিস
আমি চাই নির্জনতাই আমার কথা বলুক
একটি বৃক্ষের ডালে নিজেকে লুকিয়ে যখন গান করে পাখি
আমি তার ললিত কণ্ঠের মাধবীতে কান পাতি
মরমে পরম বাণী জ্বলে, বলে পাখির কূজন সে তো পৃথিবীর সেতার
আমি চাই পাখিই আমার কথা বলুক
তেমন বৃক্ষের নকশা আমার হৃদয়পটে আঁকা
যার দেহে বাতাস দিলে মুহুর্মুহু দোলে সবুজ অক্ষর
হৃদয় উন্মুক্ত হলে যার ডালে মুখ তোলে ফুল
আমি চাই সেই বৃক্ষ আমার কথা বলুক
নদীর কথাও তোলা যায়, বলা যায় নদীর নৈকট্যের কথা
আকাশ যখন নদীর হৃদয়ে সিনা পেতে মাথা রাখে জলের বালিশে
আমি তার শয়নের নিগূঢ় সৌন্দর্যের তুবায় নত হই
দেখি সেই সমর্পিত সুন্দরের অবগাহন– যাকে বুকান্তর করে নদীর পেয়ালা
আমি চাই নদীই আমার কথা বলুক
যে পারে পারুক, আমি পারবো না আত্মগানের সারিন্দায় দোল দিতে
আমার কামনা নিতান্ত সহজ– আত্মা নিজেই বাজুক সুনামের উচ্চগ্রামে
আপনা থেকেই যখন বাজে আত্মার সুর
তার মধুময় ধ্বনি সহসাই পৌঁছে পৃথিবীর কানে
পুষ্পলব্ধ প্রশংসিত কর্মের মানবিক মৌচাক হোক একান্ত আমার
যাকে ঘিরে নিঃশব্দে জমা হবে খ্যাতির মৌমাছি
কর্মের আওয়াজ শব্দের চেয়ে বেশি চিরদিন
আমি চাই কর্মই আমার কথা বলুক।

ধূসর পাণ্ডুলিপি

(ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনকে নিবেদিত)

মিয়াজান কবির

ধূসর পাণ্ডুলিপির বিবর্ণতায় সুয়াপুর-নান্না,
হাজার বছরের শীর্ণতায় চোখে নিশ্চল কান্না!
অশ্রুধারা বয়ে চলেছে অনন্তকাল ধরে,
সে ব্যথা-বেদনায় ইতিহাসের পাতা গেছে ভরে।
মিলিয়ে গেছে কত জয়-পরাজয়ের ইতিহাস,
সাক্ষী রয়েছে তার শিলালিপি আর জীর্ণাবাস
অজানা রয়েছে অতীতের কাহিনি সে কথা জানি,
গড়িয়ে গেছে হীরা নদীর পলি ধোয়া পানি।
কালের অতলান্তে লুকিয়ে রয়েছে অতীত ইতিহাস
মাটি খুঁড়ে নোনা ইটের পাণ্ডুলিপি হোক ফাঁস।

একটি চাতকের কাছে

ম. মীজানুর রহমান

বিহঙ্গ!
কখনোই নও তুমি শুধু বিহঙ্গ!
স্বর্গের পালক পরা তুমি এক দৈব চেতনা।
জ্যোতির্ময় সোনাঝরা তোমার অঙ্গ।
তাই স্বাগত তোমাকে–
স্বাগত জানাই।
মর্ত্য হতে যাও, যাও উড়ে
উপরে, আরো উপরে।
যেতে পারো ইচ্ছে যতদূর।
স্বর্গ হতে অথবা কাছাকাছি তার
অপূর্ব প্রতীক তুমি
উদ্ভিন্ন কামনার।
আগুনের মেঘের মতন তুমি
ভেসে যাও
সুগভীর নীলে।
যদ্দুর উড়ে যাও
গীতিময় অবিরত
নীলিমা সুনীলে।
সোনালি আলোর ডানায়
সূর্যের শেষ রশ্মি রাগ;
ভাসমান দ্রুতলয়ে
উজ্জ্বল মেঘের মালায়
অজানা তৃপ্তি হয়ে
জাগে অনুরাগ।
রক্তিম ম্লানিমা তবু
মিলায় ধীরে ধীরে
তোমাকে লয়ে।
আকাশের একটি তারকা হয়ে
চলে যাও দিনের আড়ালে তবু
শুনি যে তোমার ঐ
গীতালি শৃঙ্গার।
রুপালি সে যে এক বর্ণালি তীরের ফলা;
ধিকি ধিকি জ্বলে যেন প্রদীপের শলা।
কোথা হতে শুভ্র উষা ওঠে চোখ মেলে;
না-দেখেও তোমায় ভাবি,
রয়েছ সেখানে তুমি
দিব্যি আলো জ্বেলে।
অকাশ পাতাল জুড়ে
উচ্চকিত তোমার কণ্ঠস্বর
রাতের অন্তঃপুরে
ভেসে ভেসে আসে।
নির্জন মেঘ থেকে–
বৃষ্টি হয় চাঁদের আলোর।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা উন্নয়নের মূল শক্তি

মাহবুব রেজা

রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম প্রধান উপাদান হলো জনসংখ্যা। একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো দেশের দক্ষ জনসংখ্যা। দেশের সুষম উন্নয়ন আর সুদৃঢ় অগ্রযাত্রা অনেকাংশে নির্ভর করে জনসংখ্যার সঠিক কর্মকাণ্ডের ওপর। এক্ষেত্রে সেদেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও নীতি নির্ধারকদের গৃহীত পদক্ষেপও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আশার কথা, বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘনবসতিপূর্ণ অধিক জনসংখ্যার দেশ বলে বিশ্বে স্বীকৃত বাংলাদেশকে একটি কাঠামোর মধ্যে রেখে উন্নয়নের সড়কে দেশকে নিয়ে যাচ্ছেন। বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অধিক জনসংখ্যাকে কীভাবে জনসম্পদে পরিণত করা যায় সেদিকে লক্ষ রেখে তিনি তার পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করেছেন। গণতন্ত্রের সাহসী নেতৃত্বের গুণাবলি এবং তাঁর সময়োচিত ও যুগোপযোগী সিদ্ধান্তের কারণে আজ বিশ্বে বাংলাদেশের প্রশিক্ষিত জনসম্পদ সুনামের সঙ্গে কাজ করছে এবং তাদের পাঠানো বিপুল পরিমাণ রেমিটেন্স দেশের অগ্রযাত্রায় অতুলনীয় ভূমিকা রাখছে।

প্রতিবছরের মতো এবারও বাংলাদেশে ১১ই জুলাই পালিত হয়েছে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস। ১৯৮৭ সালের ১১ই জুলাই পৃথিবীর জনসংখ্যা ৫০০ কোটি স্পর্শ করে। পরবর্তী সময়ে ইউএনডিপি'র গভর্নেন্স কাউন্সিল প্রতিবছর এই দিনটিকে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস হিসেবে পালন করার প্রস্তাব করে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ বিশ্বজুড়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ১৯৮৯ সাল থেকে বিভিন্ন প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালন করে আসছে। সেসময় জাতিসংঘ কেন এ দিবসটি বিশ্বব্যাপী পালন করবে তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছে, পৃথিবীর বাড়তি জনসংখ্যাকে রাষ্ট্র তথা বিশ্ব যেন মানবসম্পদে পরিণত করার সব রকম উদ্যোগ গ্রহণ করে। প্রতিবছর জাতিসংঘ জনসংখ্যা দিবসটি পালনে বিশ্বের ১৯৮টি সদস্য দেশকে আহ্বান জানায়, আসুন জাতীয় ও আঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করে দেশের সব বয়সের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে দেশ ও দশের উন্নয়নে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এক সঙ্গে কাজ করি। বাংলাদেশও সেই ধারাবাহিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। তাই প্রতিবছর যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে এ দিবসটি পালন করা হয়।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জনসংখ্যা নানা কারণে বৃদ্ধি পাচ্ছে যা নিয়ে অনেকেই শঙ্কিত। তবে উন্নত বিশ্বে সেভাবে এই সংখ্যা বেড়ে না গেলেও অনুন্নত, উন্নয়নশীল দেশসমূহে জনসংখ্যার এই বৃদ্ধি তাদের ভবিষ্যৎ উন্নয়নকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দিচ্ছে, পাশাপাশি অনিশ্চয়তা বাড়িয়ে তুলছে। আশার কথা, বাংলাদেশের পরিস্থিতি ভিন্ন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্ব আর সঠিক দিক নির্দেশনায় বাংলাদেশ পৃথিবীর বুকে তার বিশাল জনসংখ্যাকে শক্তিশালী জনসম্পদে পরিণত করতে পারার কৃতিত্ব দেখিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে বিষয়টির প্রতি তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন তা হলো যে-কোনো বিবেচনায় বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও উন্নয়নের ব্যাপারে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেওয়া। গণতন্ত্র এবং উন্নয়নের ব্যাপারে তিনি দেশ-বিদেশের যে-কোনো ষড়যন্ত্র আর রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করেছেন। বিগত বছরগুলোয় বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার গৃহীত নানা সঠিক পদক্ষেপে শিক্ষা, ব্যবসাবাণিজ্য, শিল্প, গার্মেন্টস সেক্টর, মেডিসিন পণ্য, কৃষিপণ্য, হিমায়িত খাদ্য, জনশক্তি রপ্তানিসহ বিভিন্ন সেক্টরে বাংলাদেশ প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে। আর এই অগ্রগতির কারণে দক্ষিণ এশিয়াসহ বিশ্বে বাংলাদেশ অর্জন করেছে এক মর্যাদার আসন। এসব দিক বিবেচনায় রেখে পৃথিবীর তাবৎ বড়ো বড়ো দেশের রাষ্ট্র নায়করা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ হাতে রাষ্ট্র পরিচালনার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তারা বলছেন, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিভিন্ন খাতে যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তা বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের জন্য বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃত।

বাংলাদেশের দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনসংখ্যা জনশক্তি হিসেবে পৃথিবীতে আজ স্বীকৃত। বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে প্রবাসী আয় বা রেমিটেন্স অর্জনকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান পৃথিবীতে নবম। বিশ্বব্যাংকের 'মাইগ্রেশন অ্যান্ড রেমিটেন্স রিসেন্ট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড আউটলুক ২০১৮' শীর্ষক এক প্রতিবেদনে বিশ্বের শীর্ষ ৩০ দেশের রেমিটেন্স প্রবাহের চিত্র উঠে এসেছে। এ প্রতিবেদনে জানা যায়, ২০১৭ সালে বাংলাদেশে ১ হাজার ৩৫০ কোটি ডলার পাঠিয়েছেন বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশিরা। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুসারে, বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রায় ৮৯ লাখ বাংলাদেশি বাস করেন। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি যে অন্যতম প্রধান নিয়ামক শক্তি হয়ে উঠতে পারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো বাংলাদেশ। রেমিটেন্সের এই বিপুল পরিমাণ অর্থ দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিশ্বব্যাংকের একই প্রতিবেদন থেকে যে আশার বাণী দেওয়া হচ্ছে তা হলো– ২০১৭ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে রেমিটেন্স ১০ দশমিক ৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। বলা হচ্ছে ২০১৮ সালে বাংলাদেশের সম্ভাব্য রেমিটেন্সের পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। প্রতিবেদনটিতে আরো জানা যায়, বাংলাদেশ পঞ্চম বৃহত্তম দেশ যে দেশের এত বিপুল সংখ্যক জনশক্তি প্রবাসে

রয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে লেনদেন ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে প্রবাসী আয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পিতার অনুসৃত পথে হাঁটছেন। তিনি রাষ্ট্র পরিচালনায় পিতার দেখানো নীতিকে অনুসরণ করে সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে সবাইকে নিয়ে অগ্রগতি ও উন্নয়নের মহাসড়কে পা বাড়াচ্ছেন। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নে সুদৃঢ় পদক্ষেপ বাংলাদেশকে নিয়ে যাচ্ছে তার কাঙ্ক্ষিত পথে। বাড়তি জনসংখ্যাকে কীভাবে উৎপাদন ও উন্নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যায় সে ব্যাপারে শেখ হাসিনা সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। আর এরই ফলশ্রুতিতে বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টির নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করছে সরকার। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশি কর্মীদের চাকরিতে সুযোগ-সুবিধা, বিড়ম্বনা-সমস্যার বিষয়টিকে কীভাবে দ্রুত সমাধান করা যায় সেদিকে সর্বোচ্চ মনোযোগ দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোকে নির্দেশ দিয়েছেন। শুধু তাই নয় তিনি স্বয়ং এ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে মনিটরিং করছেন এবং তাদের সমস্যা সমাধানে সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর গৃহীত নানামুখী বাস্তবসম্মত নীতিমালা তৈরি ও তা সফল বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেছেন অধিক জনসংখ্যাকে সঠিক পথে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে তা দেশের জন্য আশীর্বাদ হয়ে ওঠে।

একটা সময় ছিল যখন অপরিকল্পিত ও বিপুল জনসংখ্যার কারণে বাংলাদেশের গণতন্ত্র, অগ্রগতি, সমৃদ্ধি, উন্নয়ন– সব কিছুই অনিশ্চয়তার অন্ধকূপে নিমজ্জিত ছিল। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের দীর্ঘ একুশ বছর পর রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ পেয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে নিয়ে নতুন করে ভাবতে থাকেন। তিনি নানামুখী ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করে দেশ ও দেশের মানুষের ভাগ্যকে সম্প্রসারিত করার ক্ষেত্রে গড়েছেন এক নতুন ইতিহাস।

বাংলাদেশে প্রথম লোহার খনি আবিষ্কার

বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো উন্নতমানের লোহার আকরিকের (ম্যাগনেটাইট) খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। দিনাজপুরের হাকিমপুরে ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের (জিএসবি) কর্মকর্তারা দুই মাস ধরে কূপ খনন করে অধিকতর পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে ১৮ই জুন তথ্য নিশ্চিত করেন। ভূগর্ভের ১৭৫০ ফুট নিচে ৪০০ ফুট পুরুত্বের লোহার আকরিকের একটি স্তর পাওয়া গেছে, যা এক ব্যতিক্রমী ঘটনা। এর ব্যাপ্তি হতে পারে ৬ থেকে ১০ বর্গকিলোমিটার পর্যন্ত।

হাকিমপুর উপজেলা সদর থেকে ১১ কিলোমিটার পূর্বে ইসবপুর গ্রাম। এ গ্রামের কৃষক ইসহাক আলীর কাছ থেকে ৫০ শতক জমি চার মাসের জন্য ৪৫ হাজার টাকায় ভাড়া নিয়ে খনিজ পদার্থের অনুসন্ধানে কূপ খনন শুরু করেছিল ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর। গত ১৯শে এপ্রিল থেকে সে গ্রামে কূপ খনন শুরু করা হয়। ৩০ সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞ দল তিন শিফটে এ কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। দুই মাস ধরে কূপ খনন করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে খনি আবিষ্কারের তথ্য নিশ্চিত করেন জিএসবির কর্মকর্তারা। তারা জানান, সেখানে ভূগর্ভের ১৭৫০ ফুট নিচে ৪০০ ফুট পুরুত্বের লোহার একটি স্তর পাওয়া গেছে। এটি বাংলাদেশে আবিষ্কৃত প্রথম লোহার খনি। যে কয়েকটি দেশে লোহার খনি আবিষ্কৃত হয়েছে, সেসব খনির লোহার মান ৫০ শতাংশের নিচে, আর বাংলাদেশের লোহার মান ৬৫ শতাংশের বেশি। বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের (বিসিএসআইআর) পরীক্ষাগার থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে। এখানে কপার, নিকেল ও ক্রোমিয়ামেরও উপস্থিতি রয়েছে। ১১৫০ ফুট গভীরতায় চুনাপাথরের সন্ধানও মিলেছে।

জিএসবির উপপরিচালক মোহাম্মদ মাসুম সাংবাদিকদের জানান, বিশ্বের যে কয়েকটি দেশে লোহার খনি আবিষ্কার করা হয়েছে, তার মধ্যে বাংলাদেশের আকরিকে লোহার শতাংশ ৬৫-এর ওপরে। কানাডা, চীন, ব্রাজিল, সুইডেন ও অস্ট্রেলিয়ার খনির লোহার মান ৫০ শতাংশের নিচে।

অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণে সহায়ক হবে এবং ভোক্তাদের ব্যয় সাশ্রয় হবে, এমন আশা করাই যায়। এর চেয়েও বড়ো কথা, লোহার খনি অনুসন্ধানে কূপ খনন শুরু হলে অনেক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এ সুযোগেই একটি বড়ো সুখবর নিঃসন্দেহে। মানুষ কাজ পেলে তাদের জীবনযাত্রার মানে উত্তরণ ঘটবে; যা গোটা দেশের অর্থনীতির জন্য সুফল বয়ে আনবে।

প্রতিবেদন: মুকসিতুল ফারহানা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপলব্ধি করতে পেরেছেন দেশের এই বিশাল সংখ্যক জনসংখ্যাকে যদি শিক্ষা এবং উন্নতমানের প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মীর হাতে রূপান্তরিত করা যায় তাহলে তারাও দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারবে। বিশেষ করে ভাগ্যের অন্বেষণে যেসব শ্রমিক দেশের বাইরে যায় তাদের যদি যুগোপযোগী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ দিতে পারা যায় তাহলে তাদের উপার্জন যেরকম বেড়ে যাবে ঠিক একইভাবে রেমিটেন্সের পরিমাণও বেড়ে যাবে। বাস্তবে হয়েছেও তাই। বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে প্রবাসী আয় বা রেমিটেন্স অর্জনকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ যে পৃথিবীতে নবম স্থানে অবস্থান করছে তা শেখ হাসিনার একক কৃতিত্ব বলে মনে করছেন উন্নয়ন বিশেষজ্ঞরা। সামনের দিনে এই অবস্থানকে কীভাবে আরো ওপরের দিকে নিয়ে যাওয়া যায় সে ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের সবরকম নির্দেশনা দিয়েছেন। এখানেই তাঁর নেতৃত্বের দূরদর্শিতা।

এক সময় উন্নয়ন বিশেষজ্ঞরা একটি দেশের অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে বাড়তি বোঝা হিসেবে চিহ্নিত করে বলতেন, সে দেশের উন্নয়ন আর অগ্রযাত্রা কোনোদিনই সম্ভব নয়। তারা এসব দেশকে অর্থনীতিতে পিছিয়ে পড়া দেশ হিসেবে উল্লেখ করতেন। বিশেষ করে সেসব দেশ যদি তৃতীয় বিশ্বের দেশ হতো তাহলে তো কথাই নেই। সে হিসেবে বাংলাদেশকেও একসময় অতিরিক্ত জনসংখ্যার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উন্নয়ন বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে এ ধরনের অপবাদ শুনতে হয়েছে। কিন্তু কালের পরিক্রমায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে গত দশ বছরের রাষ্ট্র পরিচালনার সফল ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ আজ কৃষি, খাদ্য, নির্মাণ শিল্প, তথ্যপ্রযুক্তি খাত, তৈরি পোশাক শিল্প, ওষুধ শিল্প, জাহাজ শিল্পসহ সব সেক্টরে অভাবনীয় উন্নয়ন সাধন করেছে।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলন একটি সমীক্ষা

বদরু মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান

মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশে সম্মিলিত চলার প্রচেষ্টায় মানুষকে শামিল হতে বাধ্য করেছিল তার পারিপার্শ্বিক বৈরি পরিবেশ। মানুষ তখনো প্রকৃতার্থে মানুষ হয়ে ওঠেনি। মানব সভ্যতার সেই আদিম যুগে তাকে সপে দিতে হয়েছিল সেসময়ের বৈরি প্রকৃতির ওপর। আর তাই অনাহার আর মৃত্যুই ছিল তাদের কাছে স্বাভাবিক। এর বিপরীতে প্রকৃতির খেয়ালখুশির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখে বিকশিত হওয়ার জন্য যে উর্বর মস্তিষ্ক দরকার তা তখনো তাদের ভেতরে অনুপস্থিত।

'দারিদ্র্যতার মূল কারণ পুঁজির স্বল্পতা'– এমনি ভাবেই দারিদ্র্যতার মূল কারণ ব্যাখ্যা করেছিল জার্মানির বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ প্রফেসর নার্কস। তার বিবেচনায় সমবায় সমিতি হলো পুঁজি গঠনের হাতিয়ার।

এই আলোকে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নে সমবায়ের ভূমিকা অপরিসীম। সমবায় আন্দোলনকে আরো গতিশীল করতে পারলে একদিকে হবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, অন্যদিকে উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড বেড়ে যাবে। আর এরই পরিপ্রেক্ষিতে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত একটি অগ্রগতির পরিসংখ্যান তুলে ধরা যেতে পারে–

কৃষি সমবায়

কৃষি সমবায়ের সাথে সম্পৃক্ত কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক সমবায় সমিতিসমূহ হচ্ছে– কৃষি/কৃষক সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক, কেন্দ্রীয় বহুমুখী সমবায় সমিতি, ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায়

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ২৫শে নভেম্বর ২০১৮ তারিখে ৪৭তম জাতীয় সমবায় দিবস উদ্‌যাপন এবং জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৬ ও ২০১৭ বিতরণ অনুষ্ঠানে পদকপ্রাপ্তদের মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা–পিআইডি

এরই এক পর্যায়ে প্রকৃতির পাঠ গ্রহণ করে অসহায় মানুষ ভাবতে শুরু করল কীভাবে তাকে এবং পারিপার্শ্বজনকে টিকিয়ে রেখে আরো উন্নততর জীবনের দিকে নিয়ে যাওয়া যায়। আর এই ভাবনা থেকে আসে মানুষের সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করার প্রবণতা। সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করার ইচ্ছা থেকে সমবায় ভাবনার উৎপত্তি। সুতরাং সমবায় বিষয়টি অনেক পরে এসে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেলেও তা আদিতেও ছিল এবং বর্তমানের হাত ধরে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

উপর্যুক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে, আদিম সাম্যবাদী সমাজের উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থা ও সঞ্চয়ের ধারণা থেকেই আধুনিক সমবায়ভিত্তিক সঞ্চয় ও দারিদ্র্য মুক্ত হওয়ার রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা সামনে এসেছে। আর্থসামাজিক উন্নয়নকে সামনে রেখে সমবায় তাই হয়ে উঠেছে একটি অনিবার্য বিষয়। সমবায় সামাজিকভাবে সমাজের মধ্যে বসবাসকারী স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীকে দেয় অধিকতর সচ্ছলতার নিশ্চয়তা।

'ঐক্যই শক্তি, ঐক্যই সাম্য'– এই ধারণা থেকেই সমবায় ধারণার উৎপত্তি। সমবায়ই পারে একটি সমাজে বসবাসকারী জনসমষ্টির উন্নয়ন করতে।

সমিতি, উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় অ্যাসোসিয়েশন ও প্রাথমিক জমি বন্ধকী ব্যাংক। বর্তমানে বাংলাদেশে এ ধরনের মোট সমিতির সংখ্যা ৭৪০১৮টি। বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক এ সকল কৃষি সমবায় সমিতিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে।

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি.

কৃষি সমবায়ীদের ঋণদানের লক্ষ্যে ১৯৪৮ সালে ইস্ট পাকিস্তান প্রভিন্সিয়াল কো-অপরারেটিভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ স্বাধীনের পর ব্যাংকটি বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। সদস্যভুক্ত কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক, কেন্দ্রীয় আখচাষী সমবায় সমিতি, উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ও সমবায় জমি বন্ধকী ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে এই ব্যাংকটির কৃষি কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ৪৭৮, শেয়ার মূলধন ৬৭৮.৫৩ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় আমানত ২৯০৪.৪৮ লক্ষ টাকা, সংরক্ষিত তহবিল ২৮৯০৭.৬৩ লক্ষ টাকা।

বাজারজাতকরণ সমবায়

এ ধরনের সমিতির সংখ্যা ৪৪৭টি এবং ব্যক্তি সদস্যা সংখ্যা ২৪,২৫০ জন। শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৭৮৫.২০ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় ও আমানতের পরিমাণ ১২৩৭.৫৯ লক্ষ টাকা। সংরক্ষিত

তহবিল ৩৩৭.৩৭ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয় আমানত ০.২৫ লক্ষ টাকা।

এছাড়া রয়েছে শিল্প সমবায়ের অধীন (ক) বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় সমিতি লি. (খ) বাংলাদেশ সমবায় শিল্প সংস্থা লি. (গ) দি ইস্টার্ন কো-অপারেটিভ জুট (ঘ) সোনার বাংলা সমবায় বণ্টন মিলস লি.।

এছাড়া মৎস্য সমবায়, মহিলা সমবায়, পরিবহণ সমবায়, গৃহায়ন সমবায়, দুগ্ধ সমবায়, বিমা সমবায়, সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায়, আশ্রায়ন সমবায় ও পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

এক হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশে ১ লক্ষ ৭৪ হাজার ৭০০ সমবায় সমিতিতে ১ কোটিরও অধিক সমবায়ী বহুমুখী আর্থিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। তাদের কার্যকরী মূলধন ১৩ হাজার ৫৮০ কোটি টাকারও বেশি যা জাতীয় অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে।

উন্নত জাতের গাভি পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত নারীদের জীবনযাত্রার উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প এবং একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের আওতায় 'ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন' শীর্ষক এক প্রকল্প সমবায় অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করে চলেছে।

বর্তমানে প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১. প্রকল্পের নাম: উন্নত জাতের গাভি পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত নারীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন

২. বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সমবায় অধিদপ্তর

৩. প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৫১৫৭.০৩ লক্ষ টাকা

৪. প্রকল্পের মেয়াদকাল: জুলাই, ২০১৬ থেকে জুন, ২০২১ খ্রি.

৫. প্রকল্পের এলাকা: ২৫টি জেলার ৫০টি উপজেলা

৬. প্রকল্পের সুবিধাভোগের সংখ্যা: ১০,০০০ জন।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

ক) গাভি পালন, দুধ উৎপাদন ও বিপননের মাধ্যমে গ্রামীণ সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও জীবনমান উন্নয়ন;

খ) গাভি/মহিষ-এর জাত উন্নয়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ;

গ) গ্রামীণ নারীদের ক্ষমতায়ন।

সুবিধাভোগী নির্বাচন

প্রকল্পভুক্ত ২৫টি জেলার ৫০টি উপজেলায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২৫০০ জন এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫০০০ জন মোট ৭৫০০ সুবিধাভোগীগণকে নির্বাচন করা হয়েছে। উক্ত নির্বাচিত ৫০০০ সুবিধাভোগীর নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর এবং জাতীয় পরিচয় পত্র সংবলিত তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ২৫০০ জন সুবিধাভোগীকে নির্বাচনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ঋণ বিতরণ: প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২৫০০ জন এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২৫০০ জন, মোট ৫০০০ জন সুবিধাভোগীদেরকে একাউন্ট পেয়ি MICR চেক বিতরণ করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে আরো ২৫০০ জনের ঋণ বিতরণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আগামী অর্থবছরে অবশিষ্ট ২৫০০ জন সুবিধাভোগীকে ঋণ বিতরণ করা হবে।

প্রশিক্ষণ: প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২৫০০ জন এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫০০০ জন, মোট ৭৫০০ জন নির্বাচিত সুবিধাভোগীদেরকে গাভি লালনপালন ও আধুনিক খামার ব্যবস্থাপনা এবং সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনা বিষয়ের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বকনা/গাভি ক্রয়: প্রকল্পের সুবিধাবঞ্চিত নারীরা ঋণপ্রাপ্ত হয়ে ১০,০০০ বকনা/গাভি ক্রয় করে লালনপালন করছে। উক্ত ক্রয়কৃত কিছু কিছু গাভি হতে দুধ উৎপাদন শুরু হয়েছে।

আমাদের দেশকে প্রতিদিনই সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সমবায়। শেখ হাসিনার সরকার সমবায় ব্যবস্থাকে নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে দেশের বৃহত্তম অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

লেখক: কবি ও প্রাবন্ধিক

আন্তর্জাতিক আর্কাইভস দিবস

৯ই জুন 'আন্তর্জাতিক আর্কাইভস দিবস'। ১৯৪৮ সালের ৯ই জুন ইউনেস্কোর অঙ্গ সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অন আর্কাইভস (আইসিএ)-এর যাত্রা শুরু। মূলত তাদের উদ্যোগেই ২০০৮ সাল থেকে পালিত হচ্ছে 'আন্তর্জাতিক আর্কাইভস দিবস'।

দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– 'আর্কাইভস: গভর্নেন্স মেমোরি অ্যান্ড হেরিটেজ'। ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি ও প্রশাসনের নীতি নির্ধারকদের সামনে আর্কাইভসের গুরুত্ব তুলে ধরার জন্যই এ দিবসের সূচনা করে আইসিএ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের নভেম্বরে আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরটি প্রতিষ্ঠা করেন। ২০০১ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় আর্কাইভস ভবন নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। বর্তমানে জাতীয় আর্কাইভসের কার্যক্রম আগারগাঁও শেরে বাংলা নগরে ৫ তলা বিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবন ও ৭ তলা বিশিষ্ট স্ট্যাক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

প্রতিবারের মতো এবারো যথাযথ গুরুত্বের সাথে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও পালিত হয় আন্তর্জাতিক আর্কাইভস দিবস। এ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী পৃথক পৃথক বাণী দিয়েছেন।

রাষ্ট্রপতি তাঁর বাণীতে বলেন, সুশাসন তথ্যভাণ্ডার ও ঐতিহ্যের ধারক হিসেবে ১৯৭২ সাল থেকে জাতীয় আর্কাইভস কাজ করে আসছে। জাতীয় আর্কাইভস আজ বাংলাদেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

অনুরূপ এক বাণীতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশের জাতীয় আর্কাইভস খুব শিগগিরই দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম সমৃদ্ধশালী কেন্দ্রীয় সংরক্ষণাগার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে বলে জানান। আজকের সৃষ্ট নথিপত্রই আগামী দিনের ঐতিহাসিক দলিল তথা মূল্যবান আর্কাইভস উপকরণ বলে বিবেচিত হবে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী আর্কাইভস সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে কর্তৃপক্ষের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানান।

প্রতিবেদন: মো. কামরুল হাসান

হজের পূর্বাপর

খান চমন-ই-এলাহি

ধর্মীয় বিষয়াবলি কেউ এড়িয়ে যেতে পারে না। মানুষের জন্মের সাথে ধর্মের রীতিনীতি প্রভাব ফেলে। ধর্ম পালনের মধ্যে মানব কল্যাণ নিহিত। সাম্য-ভ্রাতৃত্ব-বন্ধুত্ব ও মানবতাই ধর্মের মূল বিষয়। মহান আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে মানব কল্যাণের কথা বলেছেন। ভালো-মন্দের বিচারের কথা বলেছেন। সত্য প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। ন্যায়বিচার ও সুশাসনের কথা বলেছেন। সকল মানুষের অধিকার ও কল্যাণের আদেশ দিয়েছেন। উত্তম ব্যবস্থার কথাই স্রষ্টার পক্ষ থেকে নির্দেশিত হয়েছে। পবিত্র হজ তার ব্যতিক্রম নয়। পৃথিবীর মুসলমানদের বিশ্বাসের বিষয় হলো– ইমান, নামাজ, রোজা, জাকাত ও হজ। তবে হজ পালন সকলের জন্য আবশ্যকীয় নয়। এমনকি জাকাতও সকলকে দিতে হয় না। এক্ষেত্রে মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের সামর্থ্যের শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। শর্ত পূরণ হলে এগুলো করতে হয়।

ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ হজ কী– এ প্রশ্ন আসতে পারে। হ্যাঁ, হজের অর্থ হলো সংকল্প বা ইচ্ছা করা। সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে জিলহজ মাসে বিশেষ প্রক্রিয়ায় নির্দিষ্ট স্থানে এবং নির্দিষ্ট সময়ে আল্লাহর রাসুল (সা.)-এর নির্দেশিত বা শেখানো পথে নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানাদি যথাযথভাবে সুসম্পন্ন করাকে হজ বলে। হজ তিন প্রকার। কিরান, তামাত্তু ও ইফরাদ।

হজ, ইমান, নামাজ, রোজার মতোই গুরুত্বপূর্ণ ও অবশ্য করণীয়। তবে সামর্থ্যবান মুসলমান হজ পালন করবেন। শারীরিকভাবে ও আর্থিকভাবে সামর্থ্যবান হওয়া আবশ্যক। হজ যে ফরজ বা অবশ্য পালনীয় সে সম্পর্কে পবিত্র কোরান ও হাদিস দলিল হিসেবে উপস্থাপিত। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরানে সুরা আল ইমরানের ৯৭ নং আয়াতে বলেন, 'আর আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে সেসব মানুষের জন্য কাবা গৃহে হজ করা ফরজ, যাঁরা এ ঘর পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য রাখে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশ অস্বীকার করে তাতে আল্লাহর কিছু আসে যায় না। কেননা, তিনি সারাবিশ্বে কারো মুখাপেক্ষী নন; বরং যে অস্বীকার করবে সেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে'। এ আয়াতে হজ পালনের নির্দেশ সুস্পষ্ট। তবে কাবা ঘর পর্যন্ত যাওয়ার সামর্থ্য থাকলে যেতে হবে অন্যথায় নয়। তবে যাওয়া বা না যাওয়ার থেকে বড়ো কথা হলো অস্বীকার করা যাবে না। মানুষ আল্লাহর মুখাপেক্ষী, আল্লাহ মানুষের মুখাপেক্ষী নন। এবং অবিশ্বাস ও অস্বীকারের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পবিত্র কোরানে আরো ইরশাদ হয়েছে, আর তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ ও উমরা আদায় কর (সুরা বাকারা আয়াত: ১৯৬)।

আসলে শরিয়াত উপলব্ধি করার ক্ষমতা যাদের আছে তারা জানেন, আল্লাহ যা করতে আদেশ করেছেন, বলেছেন তা করতে হবে এবং যা করতে নিষেধ করেছেন তা করা যাবে না। একটি হাদিসের মাধ্যমে হজের গুরুত্ব তুলে ধরা হলো। মহানবি (সা.)-এর হাদিস হলো, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হজ করে থাকে এবং হজ পালনে কোনো প্রকার অশ্লীল কথা বলে নাই, কোনো প্রকার পাপাচার করে নাই, সে যেন সদ্য প্রসূত শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে ফিরল'। অন্য একটি হাদিসে বলা হয়েছে, 'হজ পালনকারী কখনো গরিব হয় না'। নবি করিম (সা.) আরো বলেন, 'একজন হাজির জন্য তার চারশত পরিবার অথবা নিজ পরিবারের চারশত লোকের সুপারিশ কবুল করা হবে'।

একজন হজ পালনকারীর জন্য সুখবরও রয়েছে। আল্লাহর রাসুল (সা.)-এর পক্ষ থেকে তার জন্য দোয়াও রয়েছে। এ সম্পর্কে হাদিসে বলা হয়েছে, 'হে আল্লাহ! তুমি হজকারীকে ক্ষমা করে দাও এবং সে যাদের জন্য সুপারিশ করবেন তাদেরকেও ক্ষমা করে দাও'।

নিশ্চয়ই কারো বুঝতে বাকি নাই হজ ও হাজির গুরুত্ব। এ বিষয়ে আরো একটি হাদিস হলো, 'যে ব্যক্তি হজ অথবা উমরার নিয়তে রওয়ানা হয়ে পথিমধ্যে মারা গেল, সে কোনো প্রকার জবাবদিহি ও হিসাবের সম্মুখীন হবে না। তাকে বলা হবে তুমি বেহেশতে চলে যাও'।

উপরোক্ত কোরান-হাদিসের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় হজ ও হাজির গুরুত্ব ও মর্যাদা। হজের ক্ষেত্রে বিশেষ একটি ছাড় রয়েছে, বিশেষ সুবিধা রয়েছে, তাহলো কোনো ব্যক্তি নিজে হজ করতে না পারলে অন্য কেউকে দিয়ে বদলি হজ করাতে পারবেন। তবে কিছু নিয়ম মানতে হবে। এক্ষেত্রে হজের পুরো খরচ ঐ ব্যক্তিকে বহন করতে হবে।

হজের জন্য ৯ই থেকে ১৩ই জিলহজ এ পাঁচ দিন নির্দিষ্ট। এ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে না হলে ফরজ হজ পালন করা হয় না। যা ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভে মধ্যে পড়ে না। তাই হজের ব্যাপারে সাবধানতা আবশ্যক। বিধি অনুযায়ী শরিয়ত সম্মতভাবে হজ পালন করতে হবে।

৮ই জিলহজ সূর্যোদয়ের পর ইহরাম অবস্থায় তালবিয়া পড়তে পড়তে মক্কা শরিফ থেকে মিনায় যাত্রা করতে হয়। মিনায় তাবুতে থাকতে হয়। এ অবস্থানের উদ্দেশ্য হলো আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত হওয়া। মিলিত হওয়া। এখানে থাকা অবস্থায় আল্লাহর শোকর-গোজর করতে হবে। ধ্যানে-জ্ঞানে, কাজে-কর্মে আল্লাহর সন্তুষ্টির চেষ্টা করতে হবে। সারাদিন নামাজ, কোরান তিলাওয়াত, দরুদ পাঠ ও দোয়ার মধ্যে থাকতে হবে। মনের চাওয়া অনুযায়ী হজ পালন করতে হবে। পবিত্র আরাফাতের মাঠে একজন মুসলমান শেষ বিচারের দিনের কথা মনে করতে পারেন। কিয়ামত দিবসের কথা স্মরণ করাই হবে একজন প্রকৃত মুসলমানের কাজ। যার আল্লাহর ভীতি থাকে, তাকওয়া থাকে তিনি এমনটি নিজের মধ্যে ভাববেন। এখানে সূর্যাস্ত হবে। এ সময়ে যেতে হবে

মুজদালিফায়। মুজদালিফায় উপস্থিত হয়ে আল্লাহর কোনো প্রিয় বান্দা বসে থাকবেন না। তিনি এক আজান ও দুই একামতে মাগরিব ও এশার নামাজ আদায় করে খোলা আকাশের নিচে রাত যাপন করবেন। এ খোলা আকাশ শুধুই খোলা আকাশ নয়। অফুরন্ত শিক্ষা রয়েছে এর মধ্যে। একজন প্রকৃত মুসলমান এ খোলা আকাশের নিচে তার উপলব্ধি সম্প্রসারিত করতে পারেন। এখানে ধনী-গরিব, বাদশাহ-ফকির, সাদা-কালো, দেশি-বিদেশি, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের শুধুই আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা। ঘুম-ইবাদাত চলে এভাবে। শুরু হয় ফজরের নামাজ। ফজরের নামাজ শেষে সূর্যোদয়ের পূর্বে মুজদালিফা থেকে রওনা হতে হয়। পায়ে হাঁটতে হয়। যেতে হয় মিনায়। ১০ তারিখে মিনায় উপস্থিত হতে হয় এবং জামরাতুল আকাবায় সাতটি কংকর নিক্ষেপ করতে হয়। শুধু কংকর নিক্ষেপ নয়, এখানে কুরবানি করা ওয়াজিব। আরো কিছু কাজ থাকে পুরুষ-মহিলাদের। মাথা ন্যাড়া করা বা চুল কেটে ফেলা। তবে মহিলাদের চুলের অগ্রভাগের যৎসামান্য পরিমাণ কাটলে হয়। ইহরাম অবস্থার সমাপ্তি ঘটে। এখানে মনে রাখা দরকার হজ ও উমরার প্রথম ফরজ-ইহরাম। ইহরামে একটি চাদর পরিধান করতে হয় ও একটি চাদর গায়ে জড়াতে হয়। ইহরাম অবস্থার শেষ হলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করতে হবে। পরের দিন বা তার পরের দিন সূর্যাস্তের পূর্বেই পবিত্র কাবা ঘর তাওয়াফে জিয়ারত ও সাফা-মারওয়া সায়ী করতে হয়। এগুলো সমাপ্ত হলে হজের ফরজ আদায় হয়।

প্রশ্ন জাগতে পারে তাওয়াফ কী? আসলে তাওয়াফ হলো কাবাশরিফের চতুর্দিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করা। আর পবিত্র কাবাশরিফের মর্যাদা সম্পর্কে বুঝতে হলে পবিত্র কোরান শরিফে মহান আল্লাহ তায়ালা যে বাণী উল্লেখ করেছেন, তা স্মরণ করতে হবে। যেমন সুরা মায়েদার ৯৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, 'জায়ালাল্লাহুল কাবাতাল বাইতাল হারামা কিয়ামাললিন্নাছ'। এর অর্থ হলো, আল্লাহ কাবাশরিফকে সম্মানিত ঘর এবং মানুষের টিকে থাকার কারণ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।

পবিত্র এই কাবাশরিফ কিংবা মক্কা নগরীর সাথে মানব সভ্যতা জড়িয়ে আছে। আদম (আ.) স্মরণীয় হয়ে ওঠেন। আর ইবরাহীম ও ইসমাইলের স্মৃতি চির জাগ্রত। পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত এর আবেদন থাকবে। শিক্ষণীয় হয়ে, থাকবে পিতা-পুত্রের আল্লাহ ভীতি, তাকওয়া। মহান কোরবানি। মানুষের যে ক্ষমতা নেই তা কাবাঘর রক্ষায় প্রমাণিত। আবরাহা বাদশাহ ও তার হস্তিবাহিনী পবিত্র কোরানে অবতীর্ণ সুরা ফিলে বর্ণিত ক্ষুদ্র আবাবিল পাখির আক্রমণে পরাজিত হয়।

হজ করতে হলে ইহরাম অবস্থায় কী নিষিদ্ধ তাও খেয়াল রাখতে হয়। স্ত্রী সহবাস কিংবা যৌন সংক্রান্ত আলোচনা নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ ঝগড়া-বিবাদ ও কোনো পাপাচার করা, নখ-চুল কাটা বা ছেঁড়া, বন্য পশু পাখি শিকার করা, জবেহ করা, এমনকি কেউকে দেখিয়ে দেওয়া, উকুন-মশা-মাছি ইত্যাদি মারা, বালিশে মুখ রেখে শোয়া, কাবা ঘরের গেলাফে-দেওয়ালে ও হাজরে আসওয়াদে স্পর্শ বা চুম্বন করা।

সামর্থ্যবানদের হজ করতে হয়। আল্লাহর নৈকট্য লাভের এটি একটি সুযোগ। এটা হাতছাড়া করা উচিৎ নয়। হজের শিক্ষা কাজে লাগাতে হবে। মানবতা প্রতিষ্ঠার শিক্ষা এখানে রয়েছে। হজের কথা আসলেই নবি (সা.)-এর বিদায় হজের ভাষণের কথাও মনে পড়ে যায়। ভাষণের সব কথা গুরুত্বপূর্ণ। তবে এখানে সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি কথা তুলে ধরা হলো। কারণ বিদায় হজের ভাষণ সকল মত-পথ-চিন্তার মানুষের জন্য শিক্ষণীয়, প্রয়োজনীয়।

তিনি নারী-পুরুষ, সাদা-কালোর পরিবর্তে সমগ্র মানবজাতির কথা, বিশ্বমানবতার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি বিদায় হজের ভাষণে বলেন, 'হে মানুষ! মহিলাদের উপর তোমাদের অধিকার রয়েছে। তোমাদের উপরও মহিলাদের অধিকার রয়েছে। মহিলাদের উপর তোমাদের অধিকার হলো, তারা অন্য পুরুষদের তাদের নিকট আসতে দেবে না। ইহা তোমাদের জন্য ক্রোধ ও ক্ষোভের কারণ হবে। মহিলাদের নির্লজ্জতা থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকতে হবে। যদি তারা এরূপ করে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অনুমতি দিয়াছেন, তোমরা তাদেরকে আলাদা শয্যায় শুইতে দেবে এবং মৃদু দৈহিক শাস্তি দেবে। অতঃপর তারা সংশোধিত হলে তাদের পানাহারের দিকে লক্ষ রাখবে। মহিলাদের সাথে সদয় ব্যবহার করবে। তারা তোমাদের সাহায্যকারিনী। তারা নিজেদের জন্য কিছুই রাখে না। তোমরা আল্লাহ তায়ালার এই আমানতের দায়িত্ব গ্রহণ করে আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত বাক্যের মাধ্যমে তাদেরকে নিজেদের জন্য বৈধ করে নিয়াছ'।

ফৌজদারিসহ কোনো অপরাধের দায়িত্ব যাতে নিরাপরাধ কেউকে বহন করতে না হয়, নির্যাতনের শিকার হতে না হয়, নিরাপরাধী ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি– যাতে ন্যায় বিচার লাভ করেন তার জন্য ভাষণে বলেন, 'সাবধান হও, অপরাধীর সমস্ত বোঝা অপরাধীকেই বহন করতে হবে। পিতার অপরাধের জন্য পুত্রকে এবং পুত্রের অপরাধের জন্য পিতাকে দায়ী করা যাবে না'।

বৈষম্য ও ভেদাভেদ মুক্ত অসাম্প্রদায়িক মুক্ত চিন্তার সমাজ গঠনের জন্য আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেন, 'ও হে জনতা! স্মরণ রেখো, বাসভূমি, বর্ণ ও গোত্র নির্বিশেষে প্রত্যেক মুসলিম পরস্পর ভাই, এক অবিচ্ছেদ্য ভ্রাতৃসমাজ ও সমপর্যায়ভুক্ত। আজ থেকে বংশগত কৌলিন্য বিলুপ্ত করা হলো। সেই তোমাদের মধ্যে সবার চেয়ে কুলীন, যে স্বীয় কার্য দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে'।

সমাজের শান্তি, স্থিতির জন্য ঘোষণা করলেন, 'কোনো আরবের উপর অনারবের, অনুরূপ কোনো অনারবের উপর আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তেমনি সাদার উপর কালোর বা কালোর উপর সাদার কোনো প্রধান্য নেই; তবে আল্লাহর সম্বন্ধে সজ্ঞানতা ইহার ব্যতিক্রম'।

আল্লাহর রাসুল (সা.) সমতার কথা বলেছেন, আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি স্পষ্ট করে ঘোষণা দেন, 'তোমরা দাস-দাসী বা অধীনস্থদের সম্পর্কে সতর্ক হও। তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে। তাদেরকে নির্যাতন করবার অধিকার তোমাদের নেই। নিজে যা খাবে ও পরিধান করবে তা তাদেরকে খাওয়াবে ও পরাবে। তারা অপরাধ করলে মার্জনা করবে অথবা মুক্তিদান করবে। স্মরণ রেখো, তারাও তোমাদের মতো মানুষ ও আল্লাহর সৃষ্টি'।

ধর্ম নিয়ে বিশেষভাবে বললেন, 'সাবধান! ধর্মীয় ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করবে না। কেননা ধর্মের সঠিক বন্ধনসমূহ অতিক্রম করবার ফলে তোমাদের পূর্বে বহু জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে'।

একপর্যায়ে আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বললেন, 'হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো, আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি। তার আগে উপস্থিত মানুষের উদ্দেশে বললেন, আমি কি আল্লাহ তায়ালর বার্তা তোমাদের নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছি'।

সমস্বরে চতুর্দিকে ধ্বনিত হলো, অবশ্যই। হজ ফিরে আসে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ও বিশ্বমানবের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য। পৃথিবীকে শান্তিময় করার দায়িত্ব প্রত্যেক মানুষের। হজের উদ্দেশ্য ও শিক্ষা সম্মিলিতভাবে কাজে লাগালে পৃথিবীকে আরো মানবিকভাবে পওয়া যাবে। নারী-পুরুষে, ধনী-গরিবে, রাজা-প্রজায়, বিচারক-বিচার প্রার্থীর মধ্যে ন্যায্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে। এবারের হজ সে সত্যের প্রতিধ্বনি তুলবে। শাশ্বত সুন্দরকে আলিঙ্গন করবে।

লেখক: কবি, কথাসাহিত্যিক ও কলামিস্ট

বর্ষার ফুল

মিতা খান

ঋতুরঙের পালায় গ্রীষ্মের পরই আসে বর্ষা। এ যেন শুষ্কতার পর সজলতার আবির্ভাব, রুক্ষতার পর শ্যামশ্রীর, শূন্যতার পর পূর্ণতার। সজল মেঘের গুরু গুরু গর্জনে কেঁপে ওঠে প্রকৃতির বুক। রিমঝিম বৃষ্টি পড়ার তালে তালে মেতে ওঠে পাখপাখালি। কদম্ব-বর্ষার রাজসিক আবির্ভাবকে স্বাগত জানিয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন–

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জল সিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ রভসে
ঘন গৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যামগম্ভীর সরসা।

আষাঢ়-শ্রাবণ বর্ষাকাল হলেও এর দাপট থাকে ভাদ্র পর্যন্ত। বর্ষা প্রকৃতিকে অপরূপ সবুজ শোভায় রাঙিয়ে তোলে। বর্ষা বাঙালি চাষির জন্য আশীর্বাদ। কারণ বর্ষার জলতরঙ্গ না শুনলে ফসলের ফলন ভালো হয় না। তাই বর্ষা আর বাঙালি এক। এ ঋতু বাঙালির একান্ত স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। বর্ষা এমনই এক ঋতু, যা সবচেয়ে অকাব্যিক মানুষটাকেও কবি হতে উৎসাহিত করে। বৃষ্টির ফোঁটা স্পর্শ করতে করতে কার না গলা ছেড়ে গাইতে ইচ্ছে করে– এমন দিনে তারে বলা যায়...। প্রকৃতিতে বর্ষা আসে অজস্র ফুলের সমাহার নিয়ে। বর্ষা তাই ফুলের মাস। অঝোর ধারায় বৃষ্টি ঝরার দিনে বর্ষার বিচিত্র ফুলের ভেতর লুকিয়ে থাকা সৌন্দর্য শুধু প্রকৃতিকে রাঙিয়ে তোলে না, মানুষের দেহে মনে ছড়িয়ে দেয় অপার্থিব প্রশান্তি। বর্ষা বাংলাদেশকে আপন করে বিলিয়ে দেয় এবং ফুলের সৌন্দর্য আমাদের করে তোলে সম্পদশালী, শ্রীমণ্ডিত। বর্ষার যে ফুলগুলো আমাদের দৃষ্টিকে সচকিত করে তা হলো– কেয়া, কদম, কলাবতী, শাপলা, পদ্ম, ঘাসফুল, পানাফুল, কলমী ফুল, কচুফুল, ঝিঙেফুল, কুমড়া ফুল, হেলেঞ্চা ফুল, কেশরদাম, পানি মরিচ, পাতা শেওলা, কাঁচকলা, পাট ফুল, বনতুলসী, নলখাগড়া, ফণীমনসা, উলট কমল, কেওড়া, গোলপাতা, শিয়ালকাটা, কেন্দার এবং নানা রঙের অর্কিড। বাংলাদেশের বর্ষাকালের প্রধান কয়েকটি ফুলের পরিচিতি এখানে তুলে ধরছি।

শাপলা

বর্ষার এক অনন্য ফুল শাপলা। সাদা শাপলা ফুল বাংলাদেশের জাতীয় ফুল। বিল-পুকুর-জলাশয়ে শাপলা ফুটে থাকে। বিশ্বে এই উদ্ভিদের প্রায় ৩৫টি প্রজাতি পাওয়া গেছে। শাপলা ফুল দিনের বেলা ফোঁটে এবং সরাসরি কাণ্ড ও মূলের সাথে যুক্ত থাকে। শাপলার পাতা আর ফুলের কাণ্ড বা ডাটি পানির নিচে মূলের সাথে যুক্ত থাকে। আর এই মূল যুক্ত থাকে মাটির সঙ্গে এবং পাতা পানির ওপর ভেসে থাকে। মূল থেকেই নতুন পাতার জন্ম হয়। পাতাগুলো গোল এবং সবুজ রঙের হয় কিন্তু এর নিচের দিকটা কালো রঙের হয়। ভাসমান পাতাগুলোর চারদিক ধারালো হয়। শাপলা ফুল নানা রঙের হয়ে থাকে যেমন– গোলাপি, সাদা, নীল, বেগুনি, গাঢ় লাল। বাংলাদেশের টাকা, পয়সা, দলিলপত্রে জাতীয় ফুল শাপলার জলছাপ আঁকা থাকে।

কদম

বর্ষাকালের ফুলের আলোচনা করতে গেলে কদম ফুলের কথা বলতেই হয়। এটি বর্ষার ফুলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি ফুল। কদম ফুল বিভিন্ন নামে পরিচিত যেমন– বৃত্তপুষ্প, মেঘাগম প্রিয়, কর্ণপূরক, ভৃঙ্গবল্লভ, মঞ্জুকেশিনী, পুলকি, সর্ষপ, প্রাবৃষ্য, ললনাপ্রিয়, সুরভি, সিন্ধুপুষ্প। দীর্ঘাকৃতি বহু শাখাবিশিষ্ট একটি বিশাল গাছ। রূপসি তরুর মধ্যে কদম অন্যতম। কদমের কাণ্ড সরল, উন্নত, ধূসর থেকে প্রায় কালো এবং বহু ফাটলে রুক্ষ, কর্কশ হয়ে থাকে। পাতা হয় বড়ো বড়ো, ডিম্বাকৃতি, উজ্জ্বল সবুজ তেল চকচকে এবং বিন্যাস বিপ্রতীপ হয়ে থাকে। এ ফুলের বোঁটা খুবই ছোটো। কদম ফুল দেখতে বলের মতো গোল এবং এর রং সাদা হলুদে মেশানো হয়। এ ফুলের আদি নিবাস ভারত, চীন আর মালয়। এ গাছটি আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে বেশি নজরে পড়ে। গন্ধে আর সৌন্দর্যে এ ফুল অতুলনীয়। গাছে গাছে ফুটে থাকা কদম ফুল বর্ষার প্রকৃতিতে এনে দেয় নজরকাড়া সৌন্দর্য।

কেয়া

বর্ষাকালে কদম ফুল যেমন দেয় দৃশ্যের আনন্দ তেমনি কেয়া ফুল দেয় সৌরভের গৌরব। কেয়া গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। এ গাছ লম্বায় ৩ থেকে ৪ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। এ গাছের কাণ্ড গোলাকার এবং কাঁটাযুক্ত। এর কাণ্ড থেকে শাখা-প্রশাখা বের হয়। কেয়া ফুলের পাতা ৩ থেকে ৪ মিটার পর্যন্ত লম্বা এবং ৫-৬ সেন্টিমিটার চওড়া হয়। এর ফুলগুলো শ্বেতবর্ণ, ধানের ছড়ার মতো বিন্যস্ত এবং উগ্র সুবাসযুক্ত হয়ে থাকে। এই ফুল বাংলাদেশ, ভারত, মালয়েশিয়া, আফ্রিকার গ্রীষ্মমণ্ডল এবং অস্ট্রেলিয়ায় পাওয়া যায়।

দোলনচাঁপা

বর্ষার আরেক ফুলের নাম দোলনচাঁপা। এ ফুল সাদা রঙের হয়। বড়ো বড়ো দুইটি পাপড়িযুক্ত দেখতে ভারি সুন্দর হয়। পাপড়ি দুইটি প্রজাপতির ডানার মতো দেখায় বলে এ ফুল ইংরেজি নাম বাটারফ্লাই লিলি। দোলনচাঁপাকে ‘গুল বাকাওলিও’ বলা হয়ে থাকে।

সুখদর্শন

বর্ষাকালকে আরো বর্ণিল করে তোলে লাল ও সাদা রঙের সুখদর্শন ফুল। এ ফুলগুলো আকারে বড়ো হয়। এ ফুলের আরেক নাম টাইগার লিলি। এ ফুলের পাতাগুলো বেশ চওড়া হয়ে থাকে। গুচ্ছবদ্ধভাবে এ ফুল ফোটে। এ ফুলটি টবে লাগালে দেখতে বেশ চমৎকার হয়।

ঘাসফুল

বর্ষাকালের চমৎকার একটি ফুল ঘাসফুল। এ ফুল 'জেফির লিলি' নামেও পরিচিত। এর পাতাগুলো চিকন, লম্বা আকৃতির হয়ে থাকে। বর্ষাকালে সাদা, গোলাপি, হলুদ, লাল রঙের ঘাসফুল সমতল ভূমিতে ফোটে। এ ফুল সব জায়গায় লাগানো সম্ভব।

দোপাটি

এ ফুলটি একক অথবা জোড়ায় জোড়ায় হয়ে থাকে। গোলাপি, লাল, বেগুনি, আকাশি, নীল, সাদাসহ আরো অনেক রঙের দোপাটি ফুল দেখতে পাওয়া যায়। হাইব্রিড জাতের দোপাটি ফুল ঘরের ভেতরে ও টবে লাগানো যায়। বর্ষায় এ ফুলটি বেশ আকর্ষণীয় রূপে দেখা যায়।

বকুল

বর্ষার ফুল বকুল। এ ফুলে পাঁচ বৃন্তের অসংখ্য পাপড়ি থাকে। ফুলটি দেখতে যেমন সুন্দর তেমনি গন্ধযুক্ত হয়ে থাকে। ফুলের এ গাছটির উচ্চতা ১০ থেকে ১৫ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। বকুল ফুল শুকিয়ে গেলেও এর সুবাস অনেক দিন পর্যন্ত থাকে।

গুলানার্গিস

বর্ষা মৌসুমে এ ফুল দেখতে পাওয়া যায়। এর আদি নিবাস ইউরোপে। এ ফুলের পাপড়িগুলো ৪ থেকে ৮ সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। এ ফুল কমলা ও হলুদ রঙের হয়ে থাকে। গুলানার্গিস ফুল শোভাবর্ধনকারী হিসেবে পরিচিত।

চালতা ফুল

বর্ষার প্রথমদিকে এ ফুলটি ফোটে। আকারে বেশ বড়ো হয় এ ফুলটি। সাদা বর্ণের পাপড়ির সঙ্গে হলদে পরাগ কেশরের সমাহারে চালতা ফুল দেখতে বেশ দৃষ্টিনন্দন। বর্ষার বৃষ্টিতে চিরসবুজ চালতা গাছের সৌন্দর্য প্রকৃতিকে আরো সুন্দর করে তোলে।

কলাবতী

বর্ষাকালের এক অনন্য ফুল কলাবতী। এটি 'সর্বজয়া' নামেও পরিচিত। গ্রামবাংলার আনাচে-কানাচে কিংবা শহরের বিলাসী বাগানে লাল, হলুদ এবং লাল ও হলুদ মেশানো এ ফুল পথচারীদের দৃষ্টিকে এক অনাবিল আনন্দে ভরে তোলে। কামিনী ফুল সাধারণত 'কমলা জুঁই' নামেও পরিচিত। এ ফুল এক ধরনের ক্রান্তীয়, চিরহরিৎ উদ্ভিদ– যা ছোটো, সাদা সুবাসিত। কামিনী ঘনিষ্ঠভাবে লেবু শ্রেণির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এ ফুলের ৫৫টি প্রজাতি রয়েছে। এর পাতার ধরন রোমশ এবং চকচকে হয়ে থাকে। এ ফুল একবীজপত্রী উদ্ভিদ। এটি বৃন্তযুক্ত এই ফুলে ৫টি পাপড়ি রয়েছে। ফুলের মাঝখানে দণ্ডায়মান বৃহৎ পুংকেশর। বাংলাদেশ, ভারত ছাড়া আমেরিকা, ব্রাজিল ও আফ্রিকাতে এই ফুল দেখতে পাওয়া যায়। কলাবতী ফুলটি সাধারণত স্যাঁতসেঁতে জায়গায় জন্মে।

কচুরিপানা

বর্ষায় নদী, খালবিল ও জলাশয় পানিতে কচুরিপানায় পরিপূর্ণ থাকে। তখন নতুন পানিতে শোভা পায় কচুরিপানার বেগুনি রঙের ফুল। এর আদি নিবাস দক্ষিণ আমেরিকায়।

কামিনী

এ ফুল সারা বছর ফুটলেও বর্ষা ঋতুতে এই গাছ আরো সজীব হয়ে ওঠে। বৃষ্টি ভেজা রাতে কামিনী ফুলের ঘ্রাণ বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যায়। এ ফুল সাদা রঙের হয়। ফুলটি ০.৪৭ থেকে ০.৭০ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়ে থাকে।

চন্দ্রপ্রভা

বর্ষার আরেক ফুলের নাম চন্দ্রপ্রভা। হলুদ রঙের এই ফুল দেখতে অনেকটা ঘণ্টার মতো। গন্ধহীন এ ফুলকে কেউ কেউ আবার সোনাপাতি নামেও চেনে।

রঙ্গন

এ ফুল চিরসবুজ গুল্মজাতীয় একটি উদ্ভিদ। এর আদি নিবাস সিঙ্গাপুর হলেও আমাদের দেশে শোভাবর্ধনকারী উদ্ভিদ হিসেবে অতি জনপ্রিয় একটি নাম। বর্ষাকালে রঙ্গন গাছে থোকা থোকা ফুল ফোটে। আমাদের দেশে সাদা ও লাল রঙের রঙ্গন ফুল দেখতে পাওয়া যায়।

পাশ্চাত্য দেশে যেমন বসন্তকালকে ফুলের ঋতু বলা হয়, তেমনি বাংলাদেশের বর্ষাকালকে ফুলের ঋতু হিসেবে ধরে নিতে পারি আমরা। আবহমানকাল ধরেই বাংলাদেশকে বর্ষার ফুল এক স্বাতন্ত্র্য রূপে প্রকৃতিকে সাজিয়ে তোলে। প্রকৃতিতে বর্ষার ফুলের উজ্জ্বল উপস্থিতি আমাদের মনকে এক বর্ণিল রঙে রাঙিয়ে তোলে। বর্ষার ফুল একদিকে যেমন সৌন্দর্য দেয়, গান দেয়, প্রেম দেয়, কর্মোদ্দীপনা দেয়, সমৃদ্ধি দেয়, দেয় অপার আনন্দ, দেয় আকাশে ধূসর নীলাভ মেঘমালা। তখন প্রকৃতিতে ঝরে পরে রিমঝিমিয়ে বৃষ্টির ধারা। স্বচ্ছ প্রকৃতিও নিজেকে সাজিয়ে নেয় বর্ষার ফুলে ফুলে।

লেখক: কপি রাইটার, সচিত্র বাংলাদেশ

মাদিবা ম্যান্ডেলা

নাজমা ইসলাম

গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায়ের প্রতীক হিসেবে ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে নেলসন ম্যান্ডেলা নোবেল শান্তি পুরস্কার পান। এই মহান ব্যক্তিত্ব জন্মগ্রহণ করেন ১৮ই জুলাই ১৯১৮ সালে। মৃত্যুবরণ করেন ৫ই ডিসেম্বর ২০১৩ সালে। তিনি ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রথম রাষ্ট্রপতি। তিনি ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন।

ম্যান্ডেলা দক্ষিণ আফ্রিকার এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ফোর্ট হেয়ার বিশ্ববিদ্যালয় ও উইটওয়াটারস্র্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ে পড়াশুনা করেন। এক সময় জোহানেসবার্গে আইনজীবী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। সেখানে তিনি উপনিবেশ বিরোধী কার্যক্রম ও আফ্রিকার জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৪৩ সালে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসে যোগদান করেন। তিনি বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। ১৯৬২ সালে আফ্রিকার বর্ণবাদী সরকার ম্যান্ডেলাকে গ্রেফতার করে এবং তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়। ম্যান্ডেলা ২৭ বছর কারাভোগ করেন। অধিকাংশ সময় তিনি রবেন দ্বীপে ছিলেন। ১৯৯০ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি তিনি কারামুক্ত হন। এরপর তিনি তাঁর দলের হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার শেতাঙ্গ সরকারের সঙ্গে শান্তি আলোচনায় অংশ নেন। এর ফলে দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদের অবসান ঘটে। সব বর্ণের মানুষ এক পতাকা তলে সমবেত হলে আফ্রিকায় ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পায়। ম্যান্ডেলা ২৫০টির অধিক পুরস্কার পান। ১৯৯০ সালে পান 'ভারতরত্ন' পুরস্কার। ১৯৯৩ সালে পান শান্তিতে নোবেল। দক্ষিণ আফ্রিকায় ম্যান্ডেলা তাঁর গোত্রের কাছে 'মাদিবা' নামে পরিচিত। মাদিবা অর্থ 'জাতির জনক'।

একসময় ম্যান্ডেলার পিতা হেনরি মপাকানইসা মভেজো গ্রামের মোড়ল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আফ্রিকায় তখন ঔপনিবেশিক শাসন বলবৎ ছিল। তাঁর পিতা শাসকদের বিরাগভাজন হন এবং ম্যান্ডেলার পিতাকে পদচ্যুত করেন। তিনি তখন তাঁর পরিবারসহ কুনু গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। ম্যান্ডেলার পিতা মপাকানইসার ছিল ৪ জন স্ত্রী। সন্তান ছিল ১৩ জন। ম্যান্ডেলার মা ছিলেন মপাকানইসার তৃতীয় স্ত্রী। তাঁর মায়ের নাম নোসেকেনি ফ্যালি। মাতামহের বাড়িতেই ম্যান্ডেলার শৈশব কাটে। তার ডাক নাম রোলিহ্লাহ্লা-র অর্থ গাছের ডাল ভাঙে যে অর্থাৎ 'দুষ্টু ছেলে'।

ম্যান্ডেলা তাঁর ভাইবোনদের মধ্যে প্রথম সদস্য যে স্কুলে পড়াশুনা করেছেন। স্কুলে পড়ার সময় তাঁর শিক্ষিকা তাঁর ইংরেজি নাম রাখেন 'নেলসন'।

৯ বছর বয়সে ম্যান্ডেলা পিতাকে হারান। ম্যান্ডেলা রাজপ্রাসাদের কাছে একটি মিশনারি স্কুলে পড়াশুনা করেন। থেম্বু রীতি অনুসারে ১৬ বছর বয়সে ম্যান্ডেলাকে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর গোত্রে বরণ করে নেওয়া হয়। তিনি ক্লার্কবাড়ি বোর্ডিং ইনস্টিটিউটে পড়াশোনা করেন। ৩ বছরের জায়গায় ২ বছরেই তিনি জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় পাস করেন। ১৯৩৭ সালে ম্যান্ডেলা প্রিভি কাউন্সিলে তাঁর পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। একপর্যায়ে ম্যান্ডেলা মিশনারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হেল্ডটাউন স্কুলে ভর্তি হন। ওই স্কুলে পড়ার সময় ১৯ বছর বয়সে ম্যান্ডেলা দৌড় ও মুষ্টিযুদ্ধের মতো খেলাধুলায় নিয়মিত অংশ নেন। পড়ে ফোর্ট হেয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের শেষে ম্যান্ডেলা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ছাত্র সংসদের ডাকা আন্দোলনে জড়িত হয়ে পড়েন। তাঁকে ফোর্ট হেয়ার থেকে চলে যেতে বলা হয়। শর্ত থাকে যে, যদি ছাত্র সংসদে নির্বাচিত সদস্য হতে পারেন তবেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেরত আসতে পারবেন। জীবনের পরবর্তী সময়ে কারাগারে বন্দি থাকার সময়ে ম্যান্ডেলা লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের দূর শিক্ষণ কার্যক্রমের অধীনে আইনে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। আইন বিষয়ে ম্যান্ডেলা আরো অনেক বেশি পড়াশুনায় মনোনিবেশ করেন। এসময় বেশ কিছু বর্ণবাদবিরোধী লোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। এসময় ম্যান্ডেলা জোহানেসবার্গে বসবাস করেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে তাঁর দল ন্যাশনাল পার্টি জয়লাভ করে। দলটি বর্ণবাদে বিশ্বাসী ছিল। দলটি বিভিন্ন জাতিকে আলাদা করে রাখার পক্ষপাতীও ছিল।

ন্যাশনাল পার্টির ক্ষমতায় আসার প্রেক্ষাপটে ম্যান্ডেলা সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের অসহযোগ আন্দোলনে নেতৃত্বে দেন ম্যান্ডেলা। ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে জনগণের সম্মেলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এই সম্মেলনে মুক্তি সনদ প্রণয়ন করা হয়, যা ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদ আন্দোলনের মূল ভিত্তি। ম্যান্ডেলার অন্তর বর্ণবাদের বিরুদ্ধে বরাবরই সোচ্চার ছিল। রাজনৈতিক জীবনের প্রথমভাগে ম্যান্ডেলা মহাত্মা গান্ধীর দর্শন দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদ বিরোধী কর্মীরা প্রথমদিকে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের নীতিকে গ্রহণ করে। ম্যান্ডেলা প্রথম থেকেই আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী শ্বেতাঙ্গ সরকার ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে ৫ই ডিসেম্বর ম্যান্ডেলাসহ ১৫০ জন বর্ণবাদবিরোধী কর্মীকে দেশদ্রোহিতার অপরাধে গ্রেফতার করে।

১৯৫২ সাল থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস এর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে উগ্রপন্থি আফ্রিকানিস্ট উপদলের কৃষ্ণাঙ্গ কর্মীরা বাধা দিতে শুরু করে। আফ্রিকানিস্টরা বর্ণবাদী শ্বেতাঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে চরমপন্থি আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা নিপীড়ন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে অহিংস্র আন্দোলন সফল হবে না বলে তিনি উপলব্ধি করেন এবং এজন্যই সশস্ত্র আন্দোলনের পথ বেছে নেন। ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই পর্যন্ত ম্যানডেলাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে। একসময় ম্যান্ডেলার বর্ণবাদ বিরোধী নীতির জন্য কারাবাস শুরু করেন 'রবেন দ্বীপে'। এখানে তিনি তাঁর ২৭ বছরের কারাবাসের ১৮ বছর কাটান। জেলে থাকার সময় বিশ্বজুড়ে তাঁর খ্যাতি বাড়তে থাকে। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৃষ্ণাঙ্গ নেতা হিসেবে সারা বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেন।

লেখক: প্রাবন্ধিক

উপমহাদেশের প্রথম নারী চলচ্চিত্রকার ফাতেমা বেগম

অনুপম হায়াৎ

কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছেন,

বিশ্বে যাকিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।

বিজ্ঞানের অষ্টম বিস্ময়কর আবিষ্কার চলচ্চিত্র। তবে এই আবিষ্কারের পেছনে কোনো নারীর অবদান আছে কি-না তা অদ্যাবধি জানা যায়নি। তবে নারীবিহীন চলচ্চিত্র অকল্পনীয়। ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে চলচ্চিত্র আবিষ্কার পূর্ণতা পাওয়ার পর চলচ্চিত্রে নারীকে শিল্পী হিসেবে দেখা যায়। চলচ্চিত্র আবিষ্কারের পর এর বিকাশ, উন্নয়ন, প্রযোজনা ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষের আধিপত্য এতটাই ছিল যে, ক্যামেরা নিয়ে যারা কাজ করত বা ক্যামেরা চালাতো তাদেরকে 'ক্যামেরাম্যান' বলা হতো। আর কোনো নারী এর পেছনে কাজ করলেও 'ক্যামেরাম্যান'ই বলা হতো। তাকে 'ক্যামেরা-ওম্যান' বলা হতো না।

আদি পর্বে চলচ্চিত্র পরিচালনায় নাম পাওয়া যায় পুরুষদেরই। যেমন– লুই লুমিয়ের, অগাস্ত লুমিয়েরে, টমাস আলভা এডিশন, এডউইন এস পোরটার, ডি ডবলিউ গ্রিফিথ, চার্লি চ্যাপলিন, উইলিয়াম প্যাবস্ট, লুই বুনুয়েল, হীরালাল সেন, ডি জি ফালকে, জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। তবে অসংখ্য পুরুষ নামের ভিড়ে বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করা যায় কয়েকজন দুঃসাহসী নারী নির্মাতার নামও। যেমন- ফ্রান্সের এলিস গাই ব্ল্যাশ। তিনি চলচ্চিত্রের সূচনা পর্বেই ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে নির্মাণ করেন 'ল ফি অক্স চোক্স' নামে একটি চলচ্চিত্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে লুই ওয়েবার বানান '*দি মারচেন্ট অব ভেনিস*' (১৯১৪)। এরপর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সামাজিক কুসংস্কার, ধর্মীয় বাধা, পুরুষের আধিপত্য ও অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে নারীরা চলচ্চিত্র নির্মাণ করে মেধা ও সৃজনশীলতার পরিচয় দেন। এই ধারায় ভারতীয় উপমহাদেশেও চলচ্চিত্র নির্মাণ ও পরিচালনায় নারীরা এগিয়ে আসেন। এক্ষেত্রে প্রথম নারী চলচ্চিত্র নির্মাতা হলেন ফাতেমা বেগম (১৮৯২-১৯৮৩)।

চলচ্চিত্রে জড়িত হওয়ার ক্ষেত্রে ফাতেমা বেগমের পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। তাঁর আগেও বেশ কজন নারী চলচ্চিত্রে জড়িত হন অভিনেত্রী হিসেবে। যেমন-কলকাতায় কুসুম কুমারী (১৮৭৩-১৯৪৮), মুম্বাইতে প্রথম মুসলমান অভিনেত্রী সকিনা। কুসুম কুমারী হীরালাল সেনের (১৮৬৬-১৯১৭) বিভিন্ন চলচ্চিত্রে (১৯০১-১৯১৩) অভিনয় করেন। আর সকিনা অভিনয় করেন 'ভক্তবিদুর' (১৯১০) চলচ্চিত্রে।

ফাতেমা বেগমের জন্ম ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে। আর ১৮৯৬-৯৮ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে উপমহাদেশের মুম্বাই, কলকাতা, ঢাকা, মাদ্রাজ, লাহোরে চলচ্চিত্র প্রদর্শন শুরু হয়। ওই সময় বিদেশ থেকে ক্যামেরা এনে স্বল্পদৈর্ঘ্য প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ শুরু হয়। মুম্বাইতে ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত হয় উপমহাদেশের প্রথম কাহিনিচিত্র '*রাজা হরিশচন্দ্র*', ডি জি ফালকের পরিচালনায়। ওই চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্যে কোনো নারীকে পাওয়া যায়নি। কারণ সামাজিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিতে চলচ্চিত্রে অভিনয় করা ছিল গর্হিত কাজ। ফাতেমার উর্দুভাষী পিতামাতা, পরিবার ও শিল্পী জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে তার বিয়ে হয় নওয়াব ওয়ালা গোলাম জিলানীর সঙ্গে। ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মা হন এক কন্যা সন্তানের। এই কন্যার নাম যোবায়দা। যোবায়দাই পরে ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে উপমহাদেশের প্রথম সবাকচিত্র '*আলম আরা*'র নায়িকা হন। ফাতেমার আরো দুই কন্যা সন্তানের নাম জানা যায়। এদের নাম শাহজাদী ও সুলতানা। দুজনই ছিলেন অভিনেত্রী।

ফাতেমার অভিনয় জীবন শুরু হয় মঞ্চে, উর্দু নাটকে অভিনয়ের মাধ্যমে। তিন কন্যা সন্তান নিয়ে ব্যয়বহুল দায়িত্ব তাঁর। কিন্তু ফাতেমা ভেঙে পড়েননি। তিনি মঞ্চের অভিনয়কে পুঁজি করেই ওই সময়কার আকর্ষণীয় মাধ্যম চলচ্চিত্রে জড়িত হন। চলচ্চিত্র তাঁকে খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও বিত্ত এনে দেয়। নিজে অভিনয়ের পাশাপাশি চিত্র পরিচালনা ও প্রযোজনা করেন। সেই সঙ্গে তিন কন্যা যোবায়দা, সুলতানা ও শাহজাদীকেও চলচ্চিত্রে অভিনয়ে জড়িত করেন। এভাবেই একজন মুসলমান গৃহবধূ সংগ্রামে ও সাহসের সঙ্গে পুরুষ আধিপত্যের মধ্যে নিজের ও কন্যাদের জন্যে ভারতীয় উপমহাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে উজ্জ্বল অধ্যায় সংযোজন করেন।

বিশ শতকের প্রথম দিকে মুম্বাইতে চলচ্চিত্র শিল্প বিকশিত হতে থাকে। ওই সময়ে ফাতেমা সন্তানসহ মুম্বাইর চলচ্চিত্র জগতে জড়িত হন। ফাতেমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল। তিনি ওই সময়কার প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক ও প্রযোজক আরদেশির মারওয়ান ইরানীর নির্বাক চলচ্চিত্র '*বীর অভিমাণু*' (১৯২২)-তে অভিনয় করেন। ফাতেমা অল্প সময়ের মধ্যেই মুম্বাইর চিত্রজগতে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। তিনি অনেক ছবিতে অভিনয়ের পাশাপাশি আরদেশির ইরানী ও জি কে এম দেবের সঙ্গে যৌথভাবে 'স্টার ফিল্ম কোং' গঠন করেন। ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে ফাতেমা আলাদাভাবে প্রতিষ্ঠা করেন 'ফাতেমা ফিল্মস'। এটি ছিল উপমহাদেশের প্রথম কোনো নারী প্রযোজকের চিত্র প্রতিষ্ঠান। ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে এই প্রতিষ্ঠানের নাম বদলে রাখা হয় 'ভিক্টোরিয়া ফাতেমা ফিল্মস'।

উপমহাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে ফাতেমার বড়ো অবদান চলচ্চিত্র প্রযোজনা ও পরিচালনা। তিনি ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে নিজের প্রযোজনায় '*বুলবুল পরীস্থান*' চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। এটি ছিল নির্বাক। এই চলচ্চিত্রের মাধ্যমে ফাতেমা ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম নারী নির্মাতা হিসেবে আবির্ভূত হন। আকর্ষণীয় চেহারার অধিকারী ফাতেমা নিজের প্রতিষ্ঠান ছাড়াও কোহিনুর স্টুডিও এবং ইম্পেরিয়াল স্টুডিওয়ের অনেক চিত্রে অভিনয় করেন। তাঁর সর্বশেষ অভিনীত ছবি '*দুনিয়া কিয়া হায়*' মুক্তি পায় ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে। তাঁর প্রযোজিত ছবির মধ্যে মিলন দিনার, কনকতারা, হীরারাঞ্ঝা প্রভৃতি।

ফাতেমা উপমহাদেশের চলচ্চিত্রে ক্যামেরার চাতুরী ও ফ্যান্টাসির অগ্রগামী হিসেবেও বিবেচিত। উপমহাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে ফাতেমা চলচ্চিত্র পরিবার গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর তিন কন্যাকেই চিত্রজগতে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা যোবায়দাকে ১২ বছর বয়সেই চিত্রজগতে জড়িত করেন '*কোহিনূর*' (১৯২৪) চিত্রে। যোবায়দা পরে 'রাণী যোবায়দা' নামে খ্যাতি পান। যোবায়দা উপমহাদেশের প্রথম সবাক চিত্র '*আলম আরা*'য় (১৯৩১) অভিনয় করেন নায়িকা হিসেবে। ফাতেমার দ্বিতীয় মেয়ে সুলতানাও বিভিন্ন ছবির অভিনেত্রী ছিলেন। তার আরেক কন্যা শাহজাদী *মনোরমা*, *দেবদাসী*, *বুলবুল পরীস্থান*, *লায়লা-মজনু*, *কুইন অব লাভ* প্রভৃতি চিত্রে অভিনয় করেন।

ফাতেমা ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে ৯১ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। ফাতেমা চিত্রজগতে নিজে জড়িত হয়ে এবং তিনকন্যাকে এনে সেই ১৯২০ ও ৩০ দশকে উপমহাদেশের চলচ্চিত্রে নারীদের পথযাত্রায় অগ্রপথিকের ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর পথ ধরেই পরবর্তীকালে বহু নারী চিত্রকর্মী তারকার খ্যাতি ও দ্যুতি ছড়িয়েছেন চিত্রজগতে।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক

আন্তর্জাতিক প্লাস্টিক ব্যাগমুক্ত দিবস

পিনক আলম

আন্তর্জাতিক প্লাস্টিক ব্যাগমুক্ত দিবস ৩রা জুলাই। এ দিনে প্লাস্টিক, পলিথিন ও পলিইথাইলিন বা পলিপ্রপাইলিন দিয়ে তৈরি দ্রব্যের ক্ষতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়।

দিবসটির প্রধান উদ্দেশ্য হলো– 'প্লাস্টিক ব্যাগের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা'। ৩রা জুলাই বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৩৫টি দেশে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক 'প্লাস্টিক ব্যাগমুক্ত দিবসটি' পালিত হয়।

পলিথিন হচ্ছে ইথিলিনের পলিমার। এটি অত্যন্ত পরিচিত প্লাস্টিক। উচ্চ চাপ (1000-1200 atm) ও তাপমাত্রা (200 ^{0}C) সামান্য অক্সিজেনের উপস্থিতিতে তরলীভূত হয়ে অসংখ্য ইথিলিনের অনু (৬০০-১০০০ মতান্তরে ৪০০-২০০০ অনু) পলিমারাইজেশন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত হয়ে পলিথিন গঠন করে। পলিথিন সাদা, অস্বচ্ছ ও নমনীয় কিন্তু শক্ত প্লাস্টিক। এসিড, ক্ষার ও অন্যান্য দ্রাবক দ্বারা আক্রান্ত হয় না। উত্তম তড়িৎ অন্তরক। বিভিন্ন গ্রেডের পলিথিন রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ গ্রেডগুলোর নাম:

- HDPE (High density Polyethylene)
- LLDPE (Linean Low density Plyethylene)
- LDPE (Low-density Polyethylene)

পলিথিন আমাদের বিভিন্ন কাজে লাগলেও এটি পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। স্বাভাবিকভাবে পলিথিন Biodegradable নয়। ব্যবহৃত পলিথিনের পরিত্যক্ত অংশ দীর্ঘদিন অপরিবর্তিত ও অবিকৃত থেকে মাটি, পানি ইত্যাদি দূষিত করে। পলিথিন মাটির উর্বরতা হ্রাস করে ও মাটির গুণাগুণ পরিবর্তন করে ফেলে। পলিথিন পোড়ালে এর উপাদান পলিভিনাইল ক্লোরাইড পুড়ে কার্বন মনোক্সাইড উৎপন্ন হয়ে বাতাস দূষিত করে, পলিথিনের ব্যাগ ও অন্যান্য জিনিস শহরের পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (২০০২ সালের ৯ নম্বর আইন দ্বারা সংশোধিত) এর ৬(ক) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার যে-কোনো প্রকার পলিথিন শপিং ব্যাগ বা পলিইথাইলিন বা পলিপ্রপাইলিনের তৈরি অন্য কোনো সামগ্রী পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর হলে, এরূপ সামগ্রীর উৎপাদন, আমদানি, বাজারজাতকরণ, বিক্রয়, বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন, মজুদ, বিতরণ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহণ বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করেছে।

প্লাস্টিক দূষণ

জনস্বাস্থ্যে ও পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হওয়ায় ২০০২ সালে আইন করে পলিথিন শপিং ব্যাগের উৎপাদন, ব্যবহার, বিপণন ও বাজারজাতকরণের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে বাংলাদেশ সরকার। স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও পরিবেশবাদীদের মতে, পলিথিন অপচনশীল পদার্থ হওয়ায় দীর্ঘদিন প্রকৃতিতে অবিকৃত অবস্থায় থেকে মাটিতে সূর্যালোক, পানি ও অন্যান্য উপাদান প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করে। পলিথিন পচে না বলে মাটির উর্বরতা শক্তি কমে ও উপকারী ব্যাকটেরিয়াদের বিস্তারে বাধা তৈরি করে। এছাড়া পলিথিনে মোড়ানো গরম খাবার খেলে মানুষের ক্যানসার ও চর্মরোগের সংক্রমণ হতে পারে। পলিথিনে মাছ ও মাংস প্যাকিং করলে তাতে অবায়বীয় ব্যাকটেরিয়ার সৃষ্টি হয়, যা দ্রুত পচনে সহায়তা করে। অন্যদিকে উজ্জ্বল রঙের পলিথিনে রয়েছে সীসা ও ক্যাডমিয়াম, যার সংস্পর্শে শিশুদের দৈহিক বৃদ্ধি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও চর্মপ্রদাহের সৃষ্টি করে।

প্লাস্টিক দূষণ হলো– পরিবেশ কর্তৃক প্লাস্টিক পদার্থের আহরণ যা পরবর্তীতে বন্যপ্রাণী, বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল, এমনকি মানবজাতির ওপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে। আকারের উপর ভিত্তি করে

মাইক্রো, মেমো ও ম্যাক্রোবর্জ্য এই তিনভাগে প্লাস্টিক দূষণকে শ্রেণিভাগ করা হয়। নিয়মিত প্লাস্টিক পদার্থের ব্যবহার প্লাস্টিক দূষণের মাত্রাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। পলিথিন ব্যাগ, কসমেটিক্স প্লাস্টিক, গৃহস্থালির প্লাস্টিক, বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত প্লাস্টিক পণ্যের বেশিরভাগই পুনঃচক্রায়ণ হয় না। এগুলো পরিবেশে থেকে বর্জ্যের আকার নেয়। মানুষের অসচেতনতাই প্লাস্টিক দূষণের প্রধান কারণ। প্লাস্টিক এমন এক রাসায়নিক পদার্থ, যা পরিবেশে পচতে অথবা কারখানায় পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ করতে প্রচুর সময় লাগে। তাই একে অপচ্য পদার্থ হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়।

প্লাস্টিক বর্জ্যের প্রকারভেদ

সাধারণত প্লাস্টিক দূষণের জন্য দুই ধরনের প্লাস্টিক দায়ী– মাইক্রোপ্লাস্টিক– যা সাধারণত মেগা বা বৃহৎ হিসেবে পরিগণিত এবং ম্যাক্রোপ্লাস্টিক।

প্লাস্টিক দ্রব্য ব্যবহার হ্রাসকরণের প্রচেষ্টা

প্লাস্টিক দূষণ কমানোর জন্য বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সকল প্রকার সুপার মার্কেট, কাঁচা বাজারে প্লাস্টিক ব্যাগ আদান-প্রদান কমিয়েছে। পাটের তৈরি ব্যাগের ব্যবহার নিশ্চিত করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে ও বায়োডিগ্রেডেবল পদার্থ ব্যবহার করছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও কিছু কিছু সম্প্রদায় এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্লাস্টিক পণ্য যেমন–প্লাস্টিক ব্যাগ, বোতলজাত জল ইত্যাদি ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। পণ্যে পাটজাত মোড়ক ব্যবহারে আইন হয়েছে।

পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন সংসদে পাস হয়েছে ২০১০ সালে। আর বিধিমালা হয় ২০১৩ সালে। আইনে বলা আছে, '২০ কেজি ওজনের উর্ধ্বে হলে ধান, চাল, গম ও চিনি পাটের ব্যাগ মোড়কজাত করতে হবে। ভুট্টা মোড়কজাত হবে শতভাগ পাটের ব্যাগে'। এ আইন না মানলে এক বছর কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকা অথবা উভয়দণ্ড হতে পারে। দ্বিতীয়বার একই অপরাধ করলে দ্বিগুণ দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশে পলিথিন ও পলিথিনজাত দ্রব্য সামগ্রীর অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছে। 'আন্তর্জাতিক প্লাস্টিক ব্যাগমুক্ত দিবস' উপলক্ষে বিভিন্ন সংগঠন নানা ধরনের কর্মসূচি পালন করে থাকে। এসবের মধ্যে যে বক্তব্য আসে তাহলো– বিদ্যমান আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ এবং অপরাধীদের শাস্তি প্রদান, পলিথিনের বিকল্প হিসেবে পাটের ব্যাগ ও কাপড়ের ব্যাগ সহজলভ্য করা, পলিথিন শপিং ব্যাগ তৈরির কাঁচামালের ওপর উচ্চ হারে কর আরোপ করা। বর্তমান সরকার পলিথিন ব্যবহারের ওপর বিধি নিষেধ আরোপ করেছে। যার ফলে পলিথিন ব্যবহার অনেকাংশে কমেছে।

লেখক: প্রাবন্ধিক

ঐতিহাসিক তথ্য বিকৃতির জন্য এ কে খন্দকারের ক্ষমা প্রার্থনা

কে সি বি তপু

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলার অবিসংবাদিত নেতা, সোনার বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে স্বাধীনতা বিরোধীদের ইচ্ছাকৃত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তথ্য বিকৃতি, অপপ্রচার ইত্যাদি এখনো বহমান। আশার কথা হলো– তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে অনেক অপপ্রচার কমেছে। অন্যদিকে প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য প্রচারের কারণেও বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে ১লা জুন ২০১৯ সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য দিচ্ছেন মুক্তিযুদ্ধের উপ-অধিনায়ক এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) এ কে খন্দকার বীর উত্তম

ইতিহাস পরিস্ফুট হয়েছে। এতে আপনাআপনি অপনোদন হয়েছে অনেক বিকৃত তথ্য। মুক্তিযুদ্ধের উপ-অধিনায়ক ও সাবেক মন্ত্রী অবসরপ্রাপ্ত এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকারের অসত্য তথ্য প্রত্যাহার ও ক্ষমা প্রার্থনার সাম্প্রতিক ঘটনা বাংলাদেশের ইতিহাস চর্চায় ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। অবশেষে নিজের ভুল স্বীকার করে বঙ্গবন্ধু ও জাতির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করায় তাঁর সৎ সাহস ও বোধোদয়ের জন্য সাধুবাদ প্রাপ্য। তাঁর পথ ধরে অন্যান্য ইতিহাস বিকৃতকারী, রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবী মহল নিজেদের কলুষমুক্ত করবেন– এমন আশাবাদ ব্যক্ত করছেন সুধীমহল।

১৯৭১: ভেতরে বাইরে নামক বইটিতে অসত্য তথ্য দেওয়ার জন্য প্রায় পাঁচ বছর পর সংবাদ সম্মেলন করে জাতির কাছে ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিদেহী আত্মার কাছে ক্ষমা চেয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের উপ-অধিনায়ক ও সাবেক মন্ত্রী অবসরপ্রাপ্ত এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকার বীর উত্তম। ১লা জুন ২০১৯ ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ কে খন্দকার এই ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

সংবাদ সম্মেলনে সস্ত্রীক উপস্থিত থেকে লিখিত বক্তব্যে এ কে খন্দকার বলেন, ২০১৪ সালের আগস্ট মাসে প্রথমা প্রকাশন থেকে বইটি প্রকাশের পর এর ৩২ নম্বর পৃষ্ঠায় উল্লিখিত বিশেষ অংশ ও বইয়ের আরো কিছু অংশ নিয়ে সারা দেশে প্রতিবাদ হয়। ৭ই মার্চের ভাষণ নিয়ে উল্লিখিত অংশটুকু হলো, 'বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণেই যে মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল, তা আমি মনে করি না। এই ভাষণের শেষ শব্দগুলো ছিল "জয় বাংলা, জয় পাকিস্তান"। তিনি যুদ্ধের ডাক দিয়ে বললেন "জয় পাকিস্তান"।...'

এ কে খন্দকার বলেন, এই অংশটুকু যেভাবেই আমার বইয়ে আসুক না কেন, এই অসত্য তথ্যের দায়ভার আমার এবং বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ভাষণে কখনোই 'জয় পাকিস্তান' শব্দ দুটি বলেননি। আমি তাই এই অংশ সংবলিত পুরো অনুচ্ছেদ প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। তিনি আরো বলেন, আমার বয়স এখন ৯০ বছর। আমার সমগ্র জীবনে করা কোনো ভুলের মধ্যে এটিকেই আমি একটি বড়ো ভুল মনে করি।

এ কে খন্দকার বলেন, বাংলাদেশ আজ বিশ্বে মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে পরিচিত। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বুদ্ধিদীপ্ত নেতৃত্বে দেশ আজ যুদ্ধাপরাধী মুক্ত। জীবন সায়াহ্নে থাকা একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তিনি বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

এ কে খন্দকার বলেন, 'একই সাথে আমি জাতির ও বঙ্গবন্ধুর বিদেহী আত্মার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। গোধূলি বেলায় দাঁড়িয়ে পড়া সূর্যের মতো আমি আজ বিবেকের তাড়নায় দহন হয়ে বঙ্গবন্ধুর আত্মার কাছে, জাতির কাছে ক্ষমা প্রার্থী। আমাকে ক্ষমা করে দিবেন'। বইটি সংশোধনের জন্য বইটির প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান প্রথমা প্রকাশন-এর সহযোগিতা চেয়েছেন তিনি।

বয়সের কারণে এ কে খন্দকারের শ্রবণশক্তি কমে যাওয়ায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দেন তাঁর স্ত্রী ফরিদা খন্দকার। কথা বলার শুরুতেই ফরিদা খন্দকার তাঁর স্বামী এ কে খন্দকারের কাছে জানতে চান, 'সেদিন আমাদেরকে যারা সংশোধন করতে দিল না, তাদের নাম কি আমি বলব?' তখন এ কে খন্দকার জবাব দেন, 'বলুন।'

যারা সংশোধন করতে দেননি তাদের বরাত দিয়ে ফরিদা খন্দকার বলেন, 'আমাকে শুধু বলা হলো, গুলি ছেড়ে দিয়েছ, এখন কি গুলির পিছে দৌড়াবা?' ফরিদা খন্দকার বলেন, 'বেশ কিছু লোক এসেছিল। কয়েকদিন ধরে তারা আমাকে পাহাড়া দিয়ে রেখেছিল। যেন এটা সংশোধন করা না হয়।'

এ কে খন্দকারের বই *১৯৭১: ভেতরে বাইরে* বাজার থেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছে *প্রথমা প্রকাশন*। ২রা জুন ২০১৯ *প্রথমা* প্রকাশনের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে একথা জানানো হয়। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, '*প্রথমা প্রকাশন* থেকে প্রকাশিত *১৯৭১: ভেতরে বাইরে* বইটি নিয়ে এর লেখক মুক্তিযুদ্ধের ডেপুটি চিফ অব

স্টাফ (অব.) এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকার, বীর উত্তম সম্প্রতি সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, এ বইয়ের একটি অনুচ্ছেদে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সম্পর্কে তিনি একটি ভুল তথ্য পরিবেশন করেছেন। সে ভুল তথ্যসহ পুরো অনুচ্ছেদটি তিনি বইটি থেকে প্রত্যাহার করে নিতে চান। *১৯৭১: ভেতরে বাইরে* বইয়ের লেখক এ কে খন্দকার, বীর উত্তম। তাঁর বইয়ের যে-কোনো অংশ গ্রহণ বর্জন পরিমার্জনের পূর্ণ অধিকার তাঁর আছে। লেখকের ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা বইটি বাজার থেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছি।'

১৯৭১: ভেতরে-বাইরে বইয়ের বিতর্কিত অংশের জন্য জাতির কাছে মুক্তিযুদ্ধের উপ-অধিনায়ক ও সাবেক মন্ত্রী অবসরপ্রাপ্ত এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকার প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ায় তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক এবং তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। তবে তিনি বলেছেন, একটি ঐতিহাসিক সত্যকে তিনি কেন অন্যভাবে উপস্থাপন করেছিলেন, সে প্রশ্নটি থেকেই যায়। ২রা জুন ২০১৯ আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার ধানমণ্ডির রাজনৈতিক কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার, আওয়ামী লীগের উপ-প্রচার সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আমিনসহ দলের প্রচার উপ কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

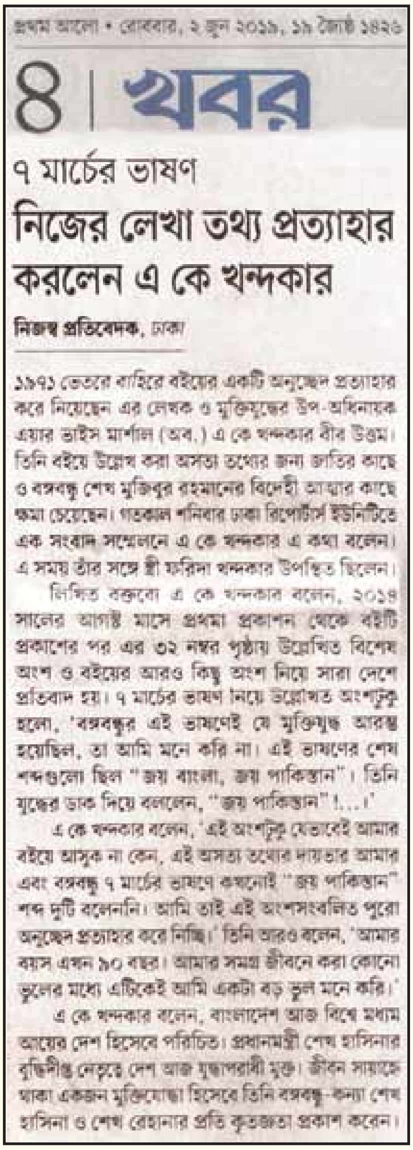

প্রথম আলো • রোববার, ২ জুন ২০১৯, ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬

৪ | খবর

৭ মার্চের ভাষণ

নিজের লেখা তথ্য প্রত্যাহার করলেন এ কে খন্দকার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

১৯৭১ ভেতরে বাহিরে বইয়ের একটি অনুচ্ছেদ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন এর লেখক ও মুক্তিযুদ্ধের উপ-অধিনায়ক এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) এ কে খন্দকার বীর উত্তম। তিনি বইয়ে উল্লেখ করা অসত্য তথ্যের জন্য জাতির কাছে ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিদেহী আত্মার কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। গতকাল শনিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কে খন্দকার এ কথা বলেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে স্ত্রী ফরিদা খন্দকার উপস্থিত ছিলেন।

লিখিত বক্তব্যে এ কে খন্দকার বলেন, ২০১৪ সালের আগস্ট মাসে প্রথমা প্রকাশন থেকে বইটি প্রকাশের পর এর ৩২ নম্বর পৃষ্ঠায় উল্লেখিত বিশেষ অংশ ও বইয়ের আরও কিছু অংশ নিয়ে সারা দেশে প্রতিবাদ হয়। ৭ মার্চের ভাষণ নিয়ে উল্লেখিত অংশটুকু হলো, 'বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণেই যে মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল, তা আমি মনে করি না। এই ভাষণের শেষ শব্দগুলো ছিল "জয় বাংলা, জয় পাকিস্তান"। তিনি যুদ্ধের ডাক দিয়ে বললেন, "জয় পাকিস্তান"!...।'

এ কে খন্দকার বলেন, 'এই অংশটুকু যেভাবেই আমার বইয়ে আসুক না কেন, এই অসত্য তথ্যের দায়ভার আমার এবং বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ভাষণে কখনোই "জয় পাকিস্তান" শব্দ দুটি বলেননি। আমি তাই এই অংশসংবলিত পুরো অনুচ্ছেদ প্রত্যাহার করে নিচ্ছি।' তিনি আরও বলেন, 'আমার বয়স এখন ৯০ বছর। আমার সমগ্র জীবনে করা কোনো ভুলের মধ্যে এটিকেই আমি একটা বড় ভুল মনে করি।'

এ কে খন্দকার বলেন, বাংলাদেশ আজ বিশ্বে মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে পরিচিত। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদৃষ্টি নেতৃত্বে দেশ আজ যুদ্ধাপরাধী মুক্ত। জীবন সায়াহ্নে থাকা একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তিনি বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

এ কে খন্দকারের ওই বিষয়টির জন্য জাতির কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়া প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ কি মনে করে সাংবাদিকরা জানতে চাইলে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'লেখক তার বক্তব্য যে-কোনো সময় প্রত্যাহার করতে পারে, ভুল স্বীকারও করতে পারে। সেটার জন্য লেখকের স্বাধীনতা আছে। তাকে ধন্যবাদ জানাই যে তার উপলব্ধি হয়েছে। বুঝতে পেরেছেন তিনি ভুল বলেছেন। তবে এ ক্ষেত্রে একটু দুর্বলতা থেকেই যায়। একজন লেখক কেন অন্যের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। একটি ঐতিহাসিক সত্যকে তিনি কেন অন্যভাবে উপস্থাপন করেছিলেন, সে প্রশ্নটি থেকেই যায়। এরপর তিনি তার স্ত্রীসহ সংবাদ সম্মেলনে এসে তিনি যে জাতির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন, বঙ্গবন্ধুর আত্মার কাছে ক্ষমা চেয়েছেন এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই'।

তথ্য বিকৃতির জন্য এ কে খন্দকারের এই সংবাদ সম্মেলন প্রকৃত ইতিহাস চর্চায় ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। একইসঙ্গে বাংলাদেশের ইতিহাস চর্চায় প্রকৃত তথ্যের দ্যুতি প্রোজ্জ্বল হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর প্রাক্কালে এমন ক্ষমা প্রার্থনার ঘটনা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে উঠুক। বোধোদয় হোক অন্যান্য ইতিহাস বিকৃতকারীর। শুরু হোক প্রকৃত ইতিহাস চর্চা।

লেখক: গবেষক ও প্রাবন্ধিক

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ জাপানি ভাষায় প্রকাশ

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বজ্রকণ্ঠে অগ্নিঝরা ভাষণ জাপানি ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। ঐতিহাসিক সেই ভাষণের জাপানি অনুবাদ প্রকাশ করেছে জাপানের টোকিওস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস। ভাষণটি ইংরেজি ব্যতীত অন্য যে-কোনো বিদেশি ভাষা হিসেবে জাপানি ভাষাতেই প্রথম অনুবাদ করা হলো।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৯শে মে জাপান সফরের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ীদের সাথে একটি গোলটেবিল সভা করেন। সেই সভায় প্রধানমন্ত্রী জাপানি ভাষায় অনুবাদকৃত ৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পুস্তিকা উন্মুক্ত এবং জাপানি ব্যবসায়ীসহ উপস্থিত সকলের কাছে বিতরণ করেন।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং দূরদর্শিতার প্রমাণ ৭ই মার্চের ভাষণ– যার মাধ্যমে তিনি স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন, সেই ভাষণের মর্মার্থ জাপানিদের কাছে তুলে ধরার অভিপ্রায়ে পুস্তিকাটি জাপানের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে বিতরণ করা হয়।

উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' ও 'গ্রাফিক নভেল মুজিব' প্রথম বিদেশি ভাষা হিসেবে জাপানি ভাষায় অনুবাদ করে প্রচার করা হয়েছে। ২০১৮ সালের নভেম্বর মাসে টোকিওস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস আয়োজিত অনুষ্ঠানে গ্রাফিক নভেল মুজিবের জাপানি অনুবাদ উন্মুক্ত করেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ রেহানা এবং জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবের স্ত্রী আকি আবে। নভেলটি জাপানের বিভিন্ন স্কুলে পাঠ করে শুনানো এবং বিতরণ করা হয়।

প্রতিবেদন: তাসলিমা আক্তার

প্রকৃতির অপূর্ব কারুকাজ সুন্দরবন

লিলি হক

হাজার নদীর দেশ, আউল বাউল গানের দেশ এই বাংলাদেশ। ছায়া ঢাকা, পাখি ডাকা, শিল্পীর তুলিতে আঁকা অরণ্য, যেন সবুজ শাড়ির আঁচল পাতা এ আমাদের মাতৃভূমি, সোনার বাংলাদেশ। জাতীয় পতাকাকে ভালোবেসে, মন, মাটি, মানুষের কাছে এসে কলম ধরেছি শৈশবকাল থেকে। যখন সুযোগ পেয়েছি টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া গ্রামবাংলার আনাচে-কানাচে ছুটে গিয়েছি, খুঁজে বেরিয়েছি লেখার মুক্তো, ঝিনুক, মানিক কবিতার সাতনরী হার। হাঁটি হাঁটি পায়ে চলা পিচঢালা রাজপথ, কখনো আকাশপথ, জল ও স্থলপথ আমার সঙ্গী, হেঁটে হেঁটে সন্ধান করেছি প্রিয়ব্রত দিনের। জানি না এ চলার শেষ কোথায়, কোনখানে, তবু যাত্রা আমার খানাখন্দ ঝোপঝাড় পেরিয়ে অজানাকে জানার সন্ধানে। এমনি এক

ধরনের কৌতূহলী মন নিয়ে বহুদিনের লালিত স্বপ্ন সুন্দরবনের হিরণপয়েন্ট যাব বলে তল্পিতল্পা বাঁধি। আমি, মি. নূরুল হক, দু ছেলে এ. জে. ইকবাল আহমদ ও ওয়াসীম হক আমরা চারজন একদিন খুলনাগামী ট্রেনে চেপে বসি। উদ্দেশ্য দশ দিনে পুরো খুলনা, রূপসা, বাগেরহাট, হিরণপয়েন্ট দেখে লেখার বিষয় নেওয়া। জগন্নাথগঞ্জ ঘাট থেকে ফেরি স্টিমারে রাত আড়াইটায় উত্তাল যমুনা পাড়ি দিয়ে সিরাজগঞ্জ ঘাটে পৌঁছি। উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত রেলওয়ে জংশন ঈশ্বরদী স্টেশনে ভোররাতে যাত্রী উঠা-নামার পর আবার ট্রেন ছাড়ে। তখন মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে সুমধুর আজানের অমিয় বাণী শোনা যাচ্ছে। পাকশী পার হয়ে ট্রেন যখন হার্ডিঞ্জ ব্রিজে উঠল তখন ভোরের আলোয় সূর্য উঁকি দিয়েছে। ছেলেদের ঘুম থেকে হক ডেকে উঠালেন, দেখ দেখ তোমরা বইয়ে যে ছবি দেখেছ এখন সত্যি দেখ। প্রমত্ত পদ্মা উথাল পাথাল ঢেউয়ে ছুটে চলেছে। আর ট্রেনে পছন্দমতো গানের ক্যাসেট বাজছে অপূর্ব সুরের মূর্ছনায়। পোড়াদহ রেলওয়ে জংশনে কুষ্টিয়া ও গোয়ালন্দ লাইনের যাত্রীরা নেমে গেল। প্রচুর খেজুর, নারকেল ছায়াবিথী দেখতে দেখতে আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা, দর্শনা হয়ে বেলা সাড়ে আটটায় যশোর পৌঁছলাম। দশটায় খুলনা নেমে নাস্তা পর্ব শেষ করি। সারা রাতের জার্নিতে সবাই ক্লান্ত অবস্থায় সোনাডাঙ্গা বাস স্টেশনে পাইকগাছাগামী কোস্টারে উঠি। দু'পাশে গ্রাম, ধান ক্ষেত। কবির ভাষায়-

আম গাছ জাম গাছ বাঁশ ঝাড় যেন
মিলে মিশে আছে ওরা আত্মীয় হেন।

প্রাণের মমতায় ততক্ষণে কথা কয়ে উঠছে মন। ক্লান্তি জুড়িয়ে 'গ্রাম ছাড়া ওই রাঙ্গামাটির পথ, আমার মন ভুলায় রে' গুনগুন করে গাইতে লাগলাম। ডুমুরিয়াচুকনগর, তারা পার হয়ে যায় কপিলমুনি। পরদিন আমরা একটা লঞ্চ রিজার্ভ করে নদীপথে যাত্রা করি হিরণপয়েন্টের দিকে। ওই এলাকায় বিভিন্ন শ্রেণির লোক বাস করে, যেমন বাওয়াল, মৌয়াল, কাঠুরিয়া, জেলে, মাঝি- এরা সবাই সংগ্রামী জীবনে অভ্যস্ত। দশ গ্রামে বড়োজোর বিশটি পরিবার সচ্ছল। বাকি সকলেই দক্ষিণ খুলনায় সুন্দরবন অঞ্চলে নিম্নবিত্ত, ভূমিহীন চাষি, ক্ষেতমজুর শ্রেণির মানুষ।

ছবির মতো দৃশ্যগুলো একের পর এক দেখছি তখন মনে হচ্ছিল যেন প্রকৃতি সবুজ শাড়ির আঁচল বিছিয়ে দিয়েছে। আমার মনের ময়ূর পাখা মেলতে চাইল বঙ্গোপসাগরের দিকে। সুন্দরি, গেওয়া, গড়ান, কেওড়া, ওড়া, আমড়হেঁতান, পশুর, শুনো ইত্যাদি গাছ প্রচুর জন্মায়। তখন ছিল বর্ষাকাল, শ্রাবণ মাস।

স্পিডবোটে বসে সুন্দরবনের দিকে তাকিয়ে এই বনভূমিকে মায়ার রাজ্য বলে মনে হয়েছে। হঠাৎ দেখি একটা হরিণ দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে, আমরা আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠি। রাতে বিপন্ন হরিণের আর্তস্বর, হরিণ ও হরিণীর স্বাভাবিক ডাক, ব্যাঘ্র মহারাজের গম্ভীর গর্জন, বনমোরগ ও মুরগির ঐকতান শুনে কল্পনায় বনবিবির রাজ্যের জীবনযাত্রা অনুধাবন করেছি। সুন্দরবনের নদীনালায় কামট (হাঙ্গর), কুমির, জঙ্গলে বাঘ, হরিণ আছে, কিন্তু তাই বলে সুন্দরবন হিরণপয়েন্ট গেলেই সব জায়গায় সবসময় এসব প্রাণী দেখা যাবে এমন কোনো কথা নেই। কুমির দেখেছি দু'একবার। হিরণপয়েন্ট স্বপ্নমায়ায় ঘেরা আর এক রাজ্য। প্রকৃতির নির্মল পরিবেশে অপরূপ দৃশ্য দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়।

দশ দিনের স্বল্প সময়ে ভ্রমণে আমরা কখনো লঞ্চ বা ট্রলার কখনো নৌকায় কখনো মাচায় দিন-রাত কাটিয়েছি। আনন্দ-আতঙ্ক একই সাথে দুটো জিনিস কাজ করছিল আমাদের মধ্যে। কটকা থেকে কটিখালীর দূরত্ব সাত কিলোমিটারের মতো।

কটকা, টাইগারপয়েন্ট, হিরণপয়েন্ট সব দেখে আমাদের কাছে কটকাই বেশি ভালো লেগেছে। কটকা রেস্ট হাউজে গোসল খাওয়া সেরে পশ্চিম দিকে হেঁটে হেঁটে আমরা অনেক কিছু দেখলাম। কালিদিয়া খালের বাঁক ঘুরে কটিখালী পৌঁছেছি। আট ঘণ্টারও বেশি সময় লেগেছে হিরণপয়েন্ট পৌঁছাতে।

কৃষ্ণপক্ষের ঘন অন্ধকার বনভূমিতে স্পর্শ করেছে। আপনরূপে অপরূপ আঁধারের বাহুপাশে ধরা দিয়েছে সুন্দরবন। মনে হয় আঁধার রাজ্যের পরশে বনবালা বুঝিবা আরো রূপসী, রহস্যময়ী মনোহারিণী হয়ে উঠেছে। প্রকৃতির এই লীলারূপের মাঝে আমি নিজের অজান্তে কখন যে হারিয়ে গেছি। এই মায়ার রাজ্যে একবার গেলে বার বার যেতে ইচ্ছা করবে। কারণ প্রকৃতি তার মায়ার সবুজ আঁচল বিছিয়ে উষ্ণ আতিথেয়তায় আলিঙ্গন করে। রাতের জঙ্গল বড়ো মায়াবিনী, বড়ো মোহময়, যেখানে গেলে রবীন্দ্র সংগীত গাইতে, শুনতে ইচ্ছা করে। 'মায়াবন বিহারিণী' বিশেষ করে আমি পূর্ণিমা রাতের কথা বলছি। মাথার উপর উড়তে উড়তে ডাকতে থাকে নল ঘোড়া পাখি। নিম পেচা, মেছো পেচা আরো কত ধরনের পাখি, প্রায় ২৭০০ জাতের পাখি আছে এ বিশাল এলাকাজুড়ে। জীবজন্তু আছে ৪০০ প্রজাতির।

হিরণপয়েন্ট এলাকায় বেড়ানোর সময় আমরা প্রকৃতির সাথে মিশে যাবার জন্যে সবুজ পোশাক বেশি পরতাম। আমরা এখানে বসেই আলোচনা করি আবার আসব নভেম্বর মাসে। কারণ নভেম্বরে রাস পূর্ণিমায় দুবলায় কমল কামিনীর মেলা বসে। তখন আশপাশের এলাকা থেকে হাজার হাজার মানুষ ট্রলারে চেপে কুঙ্গা নদীর মোহনায় আলোর কোলে মেলা দেখতে আসে। যাহোক সব শেষে বলতে দ্বিধা নেই, হিরণপয়েন্ট থেকে বিদায় নেবার সময় মনে হয়েছে এখানে না এলে শুধু বই পড়ে বা গল্প শুনে বুঝতে পারতাম না প্রকৃতির অপূর্ব কারুকাজ এত মোহময়, এত রূপসী। সুপ্রিয় পাঠক, চলুন প্রাণের টানে হিরণপয়েন্টের সমুদ্র পাড়ে ঘুরে আসি। আমাদের প্রাণের সম্পদ সুন্দরবনকে যা এখন ইউনেস্কোর 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ'-এর অন্তর্ভুক্ত– তাকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হই।

লেখক: সাহিত্যিক ও সম্পাদক, চয়ন

রোহিঙ্গা ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব মানবতার প্রতীক

মীর আফরোজ জামান

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৪৮ বছর অতিবাহিত হলেও এখনো পাকিস্তানিপন্থিরা এই বাংলাদেশকে নিয়ে নানাভাবে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। দেশ এখন জেগে উঠেছে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে। অর্থনৈতিকভাবে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশের মর্যাদা নিয়ে সারা বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে দেশের সেবা করে যাচ্ছেন। শেখ হাসিনার বাবা বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই দেশকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতেন– এই দেশে একদিন সোনা ফলবে, সোনার বাংলায় পরিণত হবে। জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে আজ সোনার বাংলায় পরিণত করেছে। পাকিস্তানের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান একটি জনসভায় বলেছিলেন– 'একটি দেশকে কীভাবে উন্নত করতে হয় তোমরা যদি দেখতে চাও– তাহলে বাংলাদেশে গিয়ে দেখে আসো, শেখ হাসিনার কাছ থেকে শিখে আসো'। মিয়ানমার সার্কভুক্ত আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র। তাদের সঙ্গে এখনো আমাদের বন্ধুত্ব সম্পর্ক রয়েছে। ২০১৬-২০১৭ সালে তাদের রাখাইন রাজ্য থেকে বসবাসরত মুসলিমদের জোরপূর্বক বিতারিত করেছে। শিশু-নারীদের ওপর নৃশংস অত্যাচার নির্যাতন করেছে। মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রায় ১২ লক্ষ রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়েছেন। জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্থনি গুয়েতেরাসসহ বিশ্বের অনেক রাষ্ট্র প্রধান সরেজমিনে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের দেখে গেছেন। অনেক দেশের প্রতিনিধিরা এখনো আসছেন। যে কারণে আজ শেখ হাসিনা সারা বিশ্বের নেত্রী। শেখ হাসিনা মানবতার শিক্ষা দিয়ে সারা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। যেজন্য আজ পৃথিবীতে মানবতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের প্রতীক শেখ হাসিনা। পৃথিবীর সমস্ত দেশ এখন শেখ হাসিনার পক্ষে রয়েছে।

লেখক: প্রাবন্ধিক

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংশীদার চরফ্যাশনের উদ্যোক্তা রহিম ও সাফিয়া

মো. শাহেদুল ইসলাম

ভোলা জেলার চরফ্যাশন মহিলা কলেজের স্নাতক শ্রেণির ছাত্রী সাফিয়া বেগম ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্নাতক পরীক্ষার্থী আব্দুর রহিম চরফ্যাশন উপজেলারই আমিনাবাদ ইউনিয়নের তথ্যসেবা কেন্দ্রের উদ্যোক্তা। ব্যক্তিগত জীবনে উভয়ে আপন ভাইবোন। পিতা আব্দুর রহমান মোল্লা একজন কৃষক। অভাবের সংসারে ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার খরচ জোগানো তার জন্য কষ্টকর

হয়ে পড়েছিল। পিতার ওপর দায়িত্বের ভার হ্রাস করার জন্য শিক্ষা জীবনের পাশাপাশি বিকল্প আয়ের সন্ধান করছিল এই দুই ভাইবোন। এমন সময় বাড়ির পাশে ইউনিয়ন তথ্যসেবা কেন্দ্রটির কার্যক্রম শুরু হয়। ওই তথ্যকেন্দ্রে উদ্যোক্তা হিসেবে যোগ দেন সাফিয়া বেগম ও আব্দুর রহিম। পরিশ্রম এবং কাজের প্রতি আন্তরিকতা থাকার কারণে আজ এই দুই ভাইবোন ভোলার ৬২টি ইউনিয়ন তথ্যসেবা কেন্দ্রে ১২৪ জন উদ্যোক্তার মধ্যে সেরা উদ্যোক্তা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

তথ্যকেন্দ্রের দায়িত্ব গ্রহণের আগে আব্দুর রহিম একটি এনজিওর মাধ্যমে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। কিন্তু সাফিয়া বেগম উদ্যোক্তার দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রকল্পের আওতায় ঢাকা ও ভোলায় কয়েকবার কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুযোগ গ্রহণ করেন। যার ফলে বর্তমানে সাফিয়া একজন দক্ষ কম্পিউটার কর্মী হয়ে উঠেছেন। কম্পিউটার বিদ্যার অনেক কিছুই এখন তার দক্ষতার মধ্যে।

আব্দুর রহিম জানান, প্রকল্পের আওতায় পাওয়া একটি ল্যাপটপ, একটি ডেস্কটপ, একটি ক্যামেরা, একটি স্ক্যানার এবং একটি মডেম নিয়ে প্রথম যাত্রা শুরু করেন। পরবর্তীতে নিজেদের কাজের পরিধি বেড়ে যাওয়ায় এবং আয় বৃদ্ধির প্রয়োজনে ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি ইউপিএস, আরো ২টি কম্পিউটার, দুটি প্রিন্টার, একটি লেমিনেটিং মেশিন ও ছবি তোলার লাইট স্ট্রান্ড ক্রয় করেন। তার মতে, এ পেশাতে নতুনত্ব এবং গ্রামীণ মানুষের সরাসরি সেবা করার ব্যাপক সুযোগও আছে।

সাফিয়া বেগম জানান, তথ্য ও সেবা কেন্দ্র থেকে আয় দিয়ে পড়াশোনার খরচের পাশাপাশি দুই ভাইবোন ও ৬ বন্ধু মিলে ‘প্রাইম সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিমিটেড’ নামে একটি অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু করি। সমবায় অফিস থেকে নিবন্ধনকৃত এই প্রতিষ্ঠানে তাদের বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ২ লাখ টাকা। যা তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের উপার্জন থেকেই জোগান দেওয়া হয়েছে। ওই প্রতিষ্ঠান থেকে এলাকার মানুষের সেবার পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়নেও তারা বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের একজন উদ্যোক্তা হিসেবে টাকা আয় করা যায় তা একবছর আগেও চিন্তা করতে পারেনি আব্দুর রহিম। তিনি আয়ের খাত প্রসঙ্গে জানান, কম্পিটার প্রশিক্ষণ থেকে ১২ হাজার টাকা, মোবাইল ব্যাংকিং থেকে ৭ হাজার টাকা, ছবি তোলা ও লেমনেটিং থেকে ৪ হাজার টাকা, অনুষ্ঠানের ভিডিও চিত্র ধারণ থেকে ৪ হাজার ৫০০ টাকা, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ভাড়া থেকে ৬ হাজার টাকা, কম্পোজ, ই-মেইল, ব্যবহার, ইন্টারনেট ব্রাউজিং, মেমোরি লোড, মোবাইল রিচার্জ এবং স্কাইভসহ নানা খাত থেকে আয় হয়েছে। ২০১৭ সালে কেন্দ্র থেকে মাসিক লাখ টাকা আয়ের লক্ষ্য নিয়ে দুই ভাইবোন কেন্দ্রের জন্য একটি ফটোস্ট্যাস্ট মেশিন, একটি আইপিএস, একটি অটো-জেনারেটর, চারটি ডেক্সটপ কম্পিউটার ও একটি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ব্যবস্থা করে। সাবলম্বী উদ্যোক্তা হিসেবে রহিম ও সাফিয়া কম্পিউটার প্রযুক্তির জ্ঞান দিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের গর্বিত অংশীদার হতে চান– এটাই দুই ভাইবোনের লক্ষ্য। সেলক্ষ্যে তারা প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছেন।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও অতিথি প্রযোজক, বিটিভি, চট্টগ্রাম

পাট থেকে ঢেউটিন

সৃষ্টির শুরু থেকে প্রতিনিয়ত আমরা কোনো না কোনো আবিষ্কারের আভাস পেয়ে যাচ্ছি। তারমধ্যে কিছু ব্যতিক্রমী আবিষ্কার থাকে, যা সত্যিই অবাক করে দেওয়ার মতো।

বাংলাদেশি বিজ্ঞানী ড. মুবারক আহমেদ খান আবিষ্কার করেন পাট থেকে পরিবেশবান্ধব ঢেউটিন। পাটের ইংরেজি হচ্ছে Jute, তাই পাট দিয়ে তৈরি বলে এই টিনের নাম জুটিন। বাংলাদেশের এই বিজ্ঞানীর বিশ্বাস, এই জুটিন ১০০ বছর অনায়াসে রোদ, বৃষ্টি, ঝড়ের মোকাবিলা করে টিকে থাকতে পারে। টিনের প্রধান উপকরণ লেড এবং জিংকের যোগান পুরোটাই আমদানি নির্ভর। অর্থ সাশ্রয়ের কথা চিন্তা করেই বিজ্ঞানী এই আবিষ্কারটি করেন। কারণ এই জুটিনের ব্যবহার বাড়লে প্রতিবছর সাশ্রয় হবে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা।

এছাড়াও আমরা প্রতিনিয়ত যে ধাতব টিনগুলো দেখে থাকি সেগুলো কিছুদিন পরেই মরিচা ধরে যায়, ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে এবং এতে পরিবেশ নানাবিধ হুমকির সম্মুখীন হয়। কিন্তু এই জুটিনের ব্যবহার বাড়লে এই সমস্যা অনেকাংশেই কমিয়ে আনা সম্ভব।

শুনতে অবিশ্বাস্য হলেও এই জুটিন মাত্র বিশ মিনিটের মধ্যে তৈরি করা যায়। পাটের জট এবং বিভিন্ন রাসায়নিকের মিশ্রণেই মাত্র বিশ মিনিটের মধ্যে তৈরি করতে সক্ষম এই জুটিন। যদি বাণিজ্যিকভাবে এই জুটিন উৎপাদন করা হয় তবে এই জুটিন তৈরির সময় আরো কিছুটা কমিয়ে আনা সম্ভব। এতে প্রয়োজন হবে না কোনো বিশেষ কারিগরির এবং প্রয়োজন হবে না গ্যাস, বিদ্যুৎ বা অন্য বিশেষ কোনো জ্বালানির। এই জুটিন অন্যান্য ঢেউটিন থেকে শতভাগ মজবুত। যদি এই জুটিনের ব্যবহার দিনে দিনে বৃদ্ধি পায় তবে কমিয়ে আনা সম্ভব পরিবেশের ক্ষতি এবং সাশ্রয় হবে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা।

প্রতিবেদন: এমদাদুল হক ভূঁঞা

বাঘ সংরক্ষণে সমন্বিত উদ্যোগ

ভাস্করেন্দু অর্ণবানন্দ

বিশ্বব্যাপী বাঘ রক্ষায় সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১০ সালে রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে বাঘসমৃদ্ধ ১৩টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলনে বাঘ সংরক্ষণকে বেগবান করার জন্য একটি ঘোষণাপত্র তৈরি করা হয়। সেই ঘোষণাপত্রের আলোকে প্রতিবছর ২৯শে জুলাই 'বিশ্ব বাঘ দিবস' পালিত হয়। উল্লেখ্য, পৃথিবীর ১৩টি দেশে বাঘ রয়েছে। বাংলাদেশ ছাড়া অন্যান্য দেশগুলো হলো– ভারত, ইন্দোনেশিয়া, চীন, ভুটান, নেপাল, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, কম্বোডিয়া, লাওস, ভিয়েতনাম ও রাশিয়া।

বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বন অধিদপ্তর, জাতীয়-আন্তর্জাতিক ও সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংগঠন বাঘ রক্ষায় মানুষকে সচেতন ও সম্পৃক্ত করতে গুরুত্বের সাথে পালন করছে দিবসটি। এ দিবসের বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে থাকে– সমাবেশ, র‍্যালি, আলোচনাসভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ সচেতনতামূলক ও সতর্কতামূলক শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ।

বাংলাদেশের বিশ্বখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগারের প্রধান আবাসস্থল সুন্দরবন হলেও জলবায়ু পরিবর্তনে পানি-মাটিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি, শিকারি ও দস্যুদের দৌরাত্ম্য, অবাধ চলাচলে বাধা সৃষ্টি ও খাদ্য সংকটসহ প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট বেশ কিছু কারণে বাঘের বাসযোগ্য প্রতিবেশ ধ্বংস হচ্ছে। ফলে সুন্দরবনে বাঘের আবাসস্থল, জীবনাচারণ ও প্রজনন প্রক্রিয়ায় নিরাপত্তাহীনতার সৃষ্টি হয়েছে।

বাঘ বিলুপ্তি রোধকল্পে ১৯৯৪ সালের মার্চ মাসে ভারতের নয়াদিল্লিতে Global Tiger Forum (GTF) প্রতিষ্ঠিত হয়। GTF হচ্ছে বাঘ অধ্যুষিত এবং বাঘ সংরক্ষণ বিষয়ে সহায়তাদানকারী দেশসমূহের একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। বাংলাদেশ এর সদস্য।

২০১০ সালে রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে অনুষ্ঠিত Tiger Summit-এ বাঘসমৃদ্ধ ১৩টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলনে বাঘ সংরক্ষণকে বেগবান করার জন্য ঘোষণাপত্র তৈরি হয়। ২০১০ সালে জানুয়ারি মাসে থাইল্যান্ডের হুয়ানে অনুষ্ঠিত হয় টাইগার রেঞ্জ দেশগুলোর 'এশিয়া মিনিস্ট্রিয়াল কনফারেন্স'। ২০১৪ সালের ১৪-১৬ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় বাঘসমৃদ্ধ দেশ, আন্তর্জাতিক সংস্থা, বাঘ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে নিবেদিত প্রতিষ্ঠান ও এনজিওসমূহের সম্মিলিত প্রয়াসে Second Stocktaking Conference of Global Tiger Recovery Programme (GTRP) অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ই এপ্রিল ২০১৬ ভারতের নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বাঘ সংরক্ষণ সম্মেলনে বাঘসমৃদ্ধ ১৩টি দেশের মন্ত্রী, বাঘ বিশেষজ্ঞ ও উর্ধ্বতন সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন।

সাম্প্রতিককালে বিশ্বব্যাপী বাঘ ও বাঘসমৃদ্ধ বনাঞ্চলসমূহ সংরক্ষণে সম্মিলিত উদ্যোগের সহায়তাদান করছে বিশ্বব্যাংক, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, ইউএসএইড, GTI (Global Tiger Initiative) ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সংস্থা। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সংস্থাগুলো বাঘ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। খুশির ব্যাপার হলো এতে বাঘ সংরক্ষণে অনেক ক্ষেত্রেই অগ্রগতি হয়েছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশ সরকার বাঘ সংরক্ষণে বিশেষ অগ্রাধিকার কর্মসূচি ও আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরিত প্রটোকল অনুসারে সুন্দরবনের বাঘ রক্ষার জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

১. বাঘ নিধন ও হরিণ শিকার বন্ধের জন্য অধিকতর শাস্তির বিধান রেখে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন-২০১২ প্রণয়ন করেছে

২. বন বিভাগ ইতোমধ্যে Bangladesh Tiger Action Plan প্রণয়ন করেছে

৩. বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে সুন্দরবনসহ সারা দেশে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য 'Strengthening Regional Co-operation for Wildlife Protection' প্রকল্পের ৫০ জন দক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বন বিভাগের ওয়াইল্ডলাইফ ক্রাইম কন্ট্রোল ইউনিট, র‍্যাব, পুলিশ, বিজিবি, কোস্টগার্ড-এর যৌথ উদ্যোগে নিয়মিতভাবে মাঠপর্যায়ে অবৈধভাবে বন্যপ্রাণী পাচার, বিক্রি ও প্রদর্শন রোধ প্রকল্পে কাজ করে যাচ্ছে। সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকায় অসুস্থ বাঘকে সেবাদানের জন্য খুলনায় একটি Wildlife Rescue স্থাপন করা হয়েছে

৪. সুন্দরবনের চারপাশের গ্রামগুলোতে বন বিভাগ, WildTeam ও স্থানীয় জনসাধারণের সমন্বয়ে সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলায় একটি Tiger Response Team এবং সুন্দরবন সংলগ্ন গ্রাম এলাকায় ৪৯টি Village Tiger Response Team (VTRT) গঠন করেছে। এই উদ্যোগটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে সফল হয়েছে। সাম্প্রতিককালে লোকালয়ে চলে আসা বাঘ মারার প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে

৫. স্থানীয় জনসাধারণকে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত করার জন্য সুন্দরবনের আশপাশের উপজেলায় ৪টি CMC (Co-Management Committee) গঠন করা হয়েছে। জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য আয়বর্ধক

কর্মকাণ্ড এবং সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে

৬. বন্যপ্রাণী দ্বারা নিহত বা আহত মানুষের ক্ষতিপূরণ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এর আলোকে ২০১১ সাল থেকে নিয়মিতভাবে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হচ্ছে

৭. বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে উভয় সুন্দরবনের বাঘ সংরক্ষণ, বাঘ ও শিকারি প্রাণী পাচার বন্ধ, দক্ষতা বৃদ্ধি, মনিটরিং ইত্যাদির জন্য একটি প্রটোকল ও একটি এমওইউ স্বাক্ষর করা হয়েছে। এছাড়া বাঘ রক্ষায় অন্যান্য কর্মসূচি গ্রহণ করেছে সরকার ও সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরসমূহ।

বন বিভাগ জানিয়েছে, সুন্দরবনের বাঘের সুষ্ঠু সংরক্ষণ ও প্রবৃদ্ধির প্রধান বাধাগুলোকে চিহ্নিত করে অবাধ বিচরণ ও আবাসস্থলকে নির্বিঘ্ন করতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ ও নিরাপদ প্রজনন পরিবেশ তৈরির কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যে-কোনো সময়ের চেয়ে বর্তমানে সুন্দরবনে বাঘ রক্ষায় বেশি মনোযোগী সরকার। যার কারণে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কঠোর পদক্ষেপে সুন্দরবনে দস্যুতা এবং চোরা শিকারিদের তৎপরতা কমেছে। সেই সঙ্গে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে সচেতনতা বেড়েছে। এসব কারণে সুন্দরবনে আগের তুলনায় বাঘ অনেকটা সুরক্ষিত এবং বাঘের বিচরণক্ষেত্রও নিরাপদ হওয়ার ফলে সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

২১শে মে ২০১৯ তারিখে প্রকাশিত বাঘ জরিপের ফলাফলে দেখা যায়, সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা বেড়ে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ১১৪টি। এ হিসাব অনুযায়ী ২০১৮ সালের জরিপে সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা শতকরা ৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সুন্দরবনে বাঘের শিকার প্রাণীর মধ্যে চিত্রা হরিণ, শুকর ও বানর রয়েছে। বাঘের সংখ্যা বাড়াতে হলে শিকার প্রাণীর সংখ্যা বাড়াতে হবে। সরকারসহ সবাইকে জাতীয় প্রাণী বাঘ সংরক্ষণে আরো বেশি আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসতে হবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সুন্দরবন এবং সুন্দরবনের বাঘ রক্ষা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। বাংলাদেশ সরকার গ্রিন প্রবৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় মানুষদের সম্পৃক্ত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। বাঘ সংরক্ষণে বিশ্ব বাঘ দিবস পালনের গুরুত্ব অপরিসীম। সকলের সহযোগিতায় বাংলাদেশের বিশ্বখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগারের আবাসস্থল সুন্দরবন বাঘ সংরক্ষণ ও বংশবৃদ্ধিতে অনুকূল হয়ে উঠুক এবং বিশ্বের সকল বাঘের ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি হোক– এ প্রত্যাশা করি বিশ্ব বাঘ দিবসে। বাঘ সংরক্ষণে সমন্বিত উদ্যোগ সফল হোক।

লেখক: সংগঠক, সমাজচিন্তক, গবেষক ও প্রাবন্ধিক

সুন্দরবনে ২০১৫ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত বাঘ বেড়েছে আটটি

সুন্দরবনে ২০১৫ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২১শে মে ২০১৯ সুন্দরবনের বাঘ জরিপের ফল প্রকাশ এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদনের মোড়ক উন্মোচন করে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয়। জরিপের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৮ সালের জরিপে সুন্দরবনে ১১৪টি বাঘের সন্ধান পাওয়া গেছে। ২০১৫ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত এই তিন বছরে বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৮টি। ২০১৫ সালে সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা ছিল ১০৬টি। জরিপের এ ফল প্রকাশ করেন পরিবেশ ও বনমন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন। ২১শে মে ২০১৯ শেরেবাংলা নগরের আগারগাঁওয়ে অবস্থিত বন ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। এ সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, ২০১৬ সালের ১লা ডিসেম্বর থেকে ২০১৮ সালের ২৪শে এপ্রিল পর্যন্ত মোট চারটি ধাপে সুন্দরবনের সাতক্ষীরা, খুলনা, শরণখোলা রেঞ্জের তিনটি ব্লকের ১৬৫৬ বর্গকিলোমিটার এলাকায় বিশেষ এক ধরনের ক্যামেরা ব্যবহার করে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ২৪৯ দিনব্যাপী পরিচালিত এ জরিপ কার্যক্রমে ৬৩টি পূর্ণবয়স্ক বাঘ, ৪টি জুভেনাইল বাঘ এবং ৫টি অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাঘের মোট ২৪৬৪টি ছবি পাওয়া যায়। সংবাদ সম্মেলনে আরো জানানো হয়, সুন্দরবনে বাঘের বিচরণ ক্ষেত্র ৪৪৬৪ কিলোমিটার এলাকাকে আপেক্ষিক ঘনত্ব দিয়ে গুণ করে বাঘের সংখ্যা হিসাব করা হয়েছে (ইউএসএইডের অর্থায়নে বেঙ্গল টাইগার কনজারভেশন অ্যাক্টিভিটি (বাঘ) প্রকল্পের আওতায় এ জরিপ পরিচালনা করা হয়। এসইসি আর মডেলে তথ্য বিশ্লেষণ করে সুন্দরবনের প্রতি ১০০ বর্গকিলোমিটার এলাকায় বাঘের আপেক্ষিক ঘনত্ব পাওয়া গেছে ২.৫৫+০.৩২। সুন্দরবনের বাঘের বিচরণ ক্ষেত্র চার হাজার ৪৬৪ কিলোমিটার এলাকাকে আপেক্ষিক ঘনত্ব দিয়ে গুণ করে বাঘের সংখ্যা হিসাব করা হয়েছে ১১৪টি। জরিপে দেখা গেছে, বাগেরহাটের শরণখোলা রেঞ্জে বাঘের ঘনত্ব পাওয়া গেছে সবচেয়ে বেশি, প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১.২১টি বাঘ রয়েছে। জরিপে বন বিভাগকে সহযোগিতা করেছে ওয়াইল্ড টিম, যুক্তরাষ্ট্রের স্মিথ সোনিয়ান কনজারভেশন বায়োলজি ইনস্টিটিউট ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রতিবেদন: সাফায়েত হোসেন

জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব

ফারিহা হোসেন

বর্তমান বিশ্বে দ্রুত জলবায়ু পরিবর্তন একটি নৈমিত্তিক ঘটনা। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে, বাড়ছে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা। অতিমাত্রায় গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমনের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণে নানা প্রকার দুর্যোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে যেমন: অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, আকস্মিক বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি। এ কারণে মানুষের জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমগ্র বিশ্বের প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর মারাত্মকভাবে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে। এই পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব কারণে বিশ্বের যেসব দেশ ক্ষতিগ্রস্ত তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম।

বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হচ্ছে কৃষি, যা এ দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান প্রায় ১৫.৯৬% এবং ৪৭.৫% শ্রম শক্তি এ খাতে নিয়োজিত। এ দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন এবং খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তাসহ জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা এখনো কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর নির্ভরশীল। বিবিএস ২০১৪-১৫-এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি ১০ লাখ এবং প্রতিবছর ২০ লাখ লোক জনসংখ্যায় যোগ হচ্ছে। ২০৪৫ সাল নাগাদ বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১.৩৭ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়ে হবে প্রায় ২২.৫ কোটি। এ বাড়তি জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে খাদ্য উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ আবশ্যক। এলক্ষ্যে বর্তমান সরকার নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ২০১৯-২০২০ সালের বাজেটে কৃষি খাতে সরকারের ভরতুকি প্রণোদনা বেড়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বহুলাংশে কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধির ওপর নির্ভরশীল। মানুষের মৌলিক প্রয়োজন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জোগান দিয়ে থাকে কৃষি। কৃষিবিজ্ঞানীদের মতে, বীজ গজানো, পরাগায়ন, ফুল ও ফল ধরা, পরিপক্বতা হতে সুনির্দিষ্ট তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত ও সূর্যালোক প্রয়োজন। জলবায়ুর এ উপাদানগুলো পরিবর্তিত হয়েছে কিন্তু বীজ বপন ও চারা রোপণের সময় পরিবর্তন সম্ভব হয়নি। এক্ষেত্রে উদাহরণস্বরূপ গমের বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া যায়। গমের বীজ গজানোর জন্য তাপমাত্রা হলো ১৫-২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এর কম বা বেশি হলে বীজ গজাবে না। গম পাকার সময়ে আর্দ্রতা বেশি ও ঘন কুয়াশা থাকলে রোগ হবে, ফলনও কম হবে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে পাট ও বোরো ফসলের ফলনও কমে যাবে মারাত্মকভাবে। কাজেই জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি খাট করে বা কম গুরুত্ব দিয়ে দেখার সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে শেখ হাসিনার সরকার দীর্ঘমেয়াদি কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। একমুখী পদক্ষেপ নিলে হবে না, ফলপ্রসূ দীর্ঘমেয়াদি কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে। কৃষি খাতকে টেকসইভাবে এগিয়ে নিতে হলে কৃষি খাতে, শস্য উৎপাদনে বৈচিত্র্য আনতে হবে। কৃষি খাতে এই বৈচিত্র্য আনতে পারলে তা জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সহায়ক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

নোবেল বিজয়ী জাতিসংঘের ইন্টার-গভর্মেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ বা আইপিসিসির মতে, ২১০০ সালের আগেই আগামী ৫০ বছরের মধ্যে সমুদ্রের পানির উচ্চতা এক মিটার বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সমুদ্রপৃষ্ঠোর উচ্চতা এক মিটার বাড়লে বাংলাদেশের ১৭ শতাংশ জমি লবণাক্ত পানি দ্বারা তলিয়ে যাবে। এতে ১৩ শতাংশ মানুষ প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যার পরিমাণ প্রায় দুই কোটি। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল পানির নিচে ডুবে গেলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এ অঞ্চলের কৃষি। এখানে আরেকটি কথা বলা প্রয়োজন যে, কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে কৃষিভিত্তিক উৎপাদনের জন্য যেখানে ছিল যথাযোগ্য তাপমাত্রা, ছিল ছয়টি আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ঋতু।

বাংলাদেশের সোনালি আঁশ হচ্ছে ‘পাট’। বাংলাদেশ কৃষি তথ্য সার্ভিসের এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়: এদেশে ১৯৭২-১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত পাট চাষের জমি ছিল গড়ে ১,৭৭৯ একর (গড় উৎপাদন ৯৫৩ টন) সেখানে ২০০১-২০০৭ পর্যন্ত সময়কালে চাষের জমি মাত্র ৮৬৪ একর (গড় উৎপাদন ৯১২ টন)।

বর্তমানে বাংলাদেশে চাষ করা হয় তোষা জাতের পাটের চাষ। আগে নিচু এলাকায় পাটের চাষ হলেও এখন উঁচু এলাকায় হচ্ছে। আগে দেশের পূর্বাঞ্চলে ভালো পাঠ জন্মালেও এখন পাট চাষ হয় উত্তরাঞ্চলে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বাস্তবমুখী কার্যক্রম গ্রহণের ফলে আজ দেশে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা এসেছে।

লেখক: ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক ও কলামিস্ট

ক্রিকেট বিশ্বকাপে সাকিবের রেকর্ড

২০১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসে যৌথভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার এ আসরটি দ্বাদশ আয়োজন। ৩০শে মে থেকে ১৫ই জুলাই পর্যন্ত এ প্রতিযোগিতা চলবে।

১৭ই জুন ওয়ানডে বিশ্বকাপের ১২তম আসরে ৫ম ম্যাচে বাংলাদেশ ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যকার খেলাটি ছিল টান টান উত্তেজনাপূর্ণ। দুপুর ৩.৩০ মিনিটে খেলা শুরু হয়। ইনিংস শেষে স্কোরকার্ডে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের সংগ্রহ দাঁড়ায় ৩২১ রান। বাংলাদেশের সাকিব আল হাসানের ৯৯ বলে অপরাজিত ১২৪ ও লিটন দাসের ৬৯ বলে ৯৪ রানের মহাকাব্যিক অপরাজিত ইনিংস ক্যারিবীয়দের করা ৩২১ রানের সংগ্রহটা মাত্র ৩ উইকেট হারিয়ে ৫১ বল হাতে রেখেই খেলায় জয় লাভ করে বাংলাদেশ দল। ওয়ানডে বিশ্বকাপের ১২তম আসরে ৫ম ম্যাচে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের জয়ে সারা বাংলাদেশ আনন্দে মেতে ওঠে। এ ম্যাচে অপরাজিত ১২৪ রানের অনবদ্য ইনিংসটি খেলার পথে দুর্দান্ত কিছু রেকর্ড করেছেন সাকিব আল হাসান।

সাকিব আল হাসান দুরন্ত সাহসিকতার নজির হিসেবে করেন বিশ্বকাপে নিজের দ্বিতীয় সেঞ্চুরি, তাও আবার টানা দুই ম্যাচে। বিশ্বকাপে সাকিব আল হাসান প্রথম চার ইনিংসেই পঞ্চাশোর্ধ্ব ইনিংস খেলা মাত্র চতুর্থ ক্রিকেটার হয়ে গেছেন সাকিব আল হাসান। ওয়ানডেতে ৬ হাজার রান ও ২৫০ উইকেটের ডাবলে পৌঁছেছে দ্রুততম ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান। ডাবল পূর্ণ করতে সাকিবের লেগেছে মাত্র ২০২ ম্যাচ। ১৭ই জুনের খেলায় সেঞ্চুরি করে মার্কওয়াহ, কুমার সাঙ্গাকারা, রাহুল দ্রাবিড়ের কিংবদন্তিদের পাশে নাম লেখান সাকিবও। ৮৩ বলে সেঞ্চুরি করেন সাকিব। এ বিশ্বকাপে সেটি ছিল দ্বিতীয় দ্রুততম সেঞ্চুরি। বাংলাদেশের হয়ে দ্রুততম সেঞ্চুরি ছিল এটি। সাকিব ভেঙেছেন নিজের রেকর্ডই। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে আগের ম্যাচে ৯৫ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন। এ ইনিংসের মধ্য দিয়ে বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ রান সংগ্রহের তালিকায় শীর্ষ স্থানটা আবারো পুনরুদ্ধার করেন সাকিব। বিশ্বকাপে এখনো অন্তত চারটি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। সেই চারটি ম্যাচেও অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান এমন ধারাবাহিকতা রাখবে তার খেলায়– এটাই প্রত্যাশা বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের।

প্রতিবেদন: আহনাফ হোসেন

আপনার শিশুকে সাঁতার শেখান ঝুঁকিমুক্ত থাকুন

জিনাত আরা আহমেদ

পাঁচ বছরের পারুল যেন বাবা-মায়ের চোখের মণি। বিশেষ করে বাবা বাড়িতে থাকলে ওর কথা যেন ফুরাতেই চায় না। সংসারে আর কেউ না থাকায় মা জেসমিন পারুলের দেখাশুনা আর সংসারের কাজ একাই সামলায়। দিন দিন পারুল খুব চঞ্চল হয়ে উঠছে। কখন কোথায় যায় সারাক্ষণ চোখে চোখে রেখেও সামলানো দায়। পারুলের বাবা সোহেল বাড়িতে থাকলে তাকে নজরে রাখে, তখন জেসমিনের কাজে একটু সাহায্য হয়। সেদিন সকালের খাবার খেয়ে সোহেল বেরিয়ে গেলে জেসমিন পারুলকে খাবার দিয়ে বসিয়ে ভাবে, ও খেতে থাকুক এ সুযোগে ক্ষেত থেকে কয়টা টমেটো তুলে আনি, রান্নার সময় কাজে দেবে। কিছুক্ষণ পর জেসমিন ফিরে এসে দেখে পারুলের খাবার পড়ে আছে কিন্তু ও নেই, জেসমিনের বুকটা ধক করে ওঠে। এদিক ওদিক খুঁজতে গিয়ে কোথাও না পেয়ে পাশের বাড়ির প্রতিবেশী ময়নার মাকে জিজ্ঞেস করে পারুল ওখানে গেছে কিনা, কিন্তু ওরাও কিছু বলতে পারে না। এরই মধ্যে আশপাশে সবাই খোঁজাখুঁজি করতে করতে প্রতিবেশী বাবুল দেখে পাশের ডোবাতে পারুল ভাসছে, শুনে সংজ্ঞা হারায় জেসমিন।

পানিতে ডোবার এমনি ঘটনায় প্রাণ হারাচ্ছে আমাদের দেশের অসংখ্য শিশু। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, দেশে প্রতিবছর পানিতে ডুবে মারা যায় ১০ হাজারের বেশি শিশু, যাদের বেশির ভাগেরই বয়স পাঁচ বছরের কম। বিশ্বজুড়ে প্রতিবছর কমপক্ষে তিন লাখ ২২ হাজার মানুষ পানিতে ডুবে মারা যায়। পানিতে ডুবে মৃত্যুর ৪০ শতাংশের বয়স ১৫ বছরের কম। আর এদের মধ্যে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুরা সবচেয়ে ঝুঁকিতে। পানিতে ডোবা ও অসুস্থতার পরিস্থিতি নির্ণয় অর্থাৎ মনিটরিং-এর জন্য সরকার হেলথ অ্যান্ড ইনজুরি নামে একটি সার্ভে পরিচালনা করে। এই সার্ভে থেকে জানা যায়, প্রতিবছর প্রায় ১৭ হাজার শিশু পানিতে ডুবে মারা যায়। তার মধ্যে চারগুণ অর্থাৎ প্রায় ৬৮ হাজার শিশু পানিতে ডুবে অসুস্থ হয়ে পড়ে।

অসংখ্য নদী, খাল, পুকুর, জলাবেষ্টিত আমাদের বাংলাদেশ। এ অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি বন্যাপ্রবণ। বছরের নির্দিষ্ট সময় বর্ষার আধিক্য থাকায় বহু স্থানে পানি জমে থাকে। শুধু তাই না, গ্রামে ঘরের আশপাশে পুকুর কিংবা ডোবা থাকাটা খুবই সাধারণ দৃশ্য। দূরে কোথাও যাতায়াতে নদী অথবা খাল পার হয়ে যেতে হয়। এসব ক্ষেত্রে সাঁতার না জানাটা মারাত্মক ঝুঁকি। ঝড়-বৃষ্টির দিনে প্রতিবছরই নৌ-দুর্ঘটনায় প্রাণহানি ঘটতে দেখা যায়। দৈব কিংবা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প্রাণহানির ঘটনার সাথে বেশি উদ্বেগজনক বাড়ির আশপাশে ডোবা, নালা, পুকুর জলাশয়ে শিশুদের মৃত্যু। এর পেছনের প্রধান কারণ হল, এসব শিশুরা সাঁতার জানে না।

গবেষণায় দেখা গেছে গ্রামে সকাল ৯টা থেকে ১টা পর্যন্ত সময়ে অধিকাংশ শিশু পানিতে ডুবে মারা যায়। সাধারণত এ সময়টাতে বাবা বাড়ির বাইরে থাকেন। মায়েরা সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকেন। অন্য ভাইবোনেরা স্কুলে কিংবা খেলাধুলায় ব্যস্ত থাকে। ফলে সবার অগোচরে শিশু পুকুর কিংবা জলের ধারে খেলতে গিয়ে পড়ে যায়। সাঁতার না জানার কারণে ওরা ডুবে যায়। বর্তমানে অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলেও পানিতে ডুবে শিশু মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। যেমন বাসার আশপাশে ড্রেন কিংবা ম্যানহোলে শিশু পড়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটতে দেখা যায়।

একটা সময় ছিল যখন বেশিরভাগ শিশু গ্রামের পরিবেশে বেড়ে উঠত। মায়েরা শিশু সন্তানকে নিয়ে পাশের পুকুরে কিংবা নদীর ঘাটে গোসলে যেতেন। মায়ের সাথে যেতে যেতে ছোটো থেকেই শিশুরা পানিতে ভেসে থাকার কৌশল শিখে যেত। শৈশবে শিশুর শরীরের ওজন কম থাকায় এসময় তার জন্য ভেসে থাকাটা সহজ হয়। তাছাড়া অভ্যস্ত হওয়ায় ওদের মধ্যে পানির প্রতি ভীতিবোধ থাকে না। ফলে ছোটো থেকেই গ্রামের সাঁতার জানা শিশুরা দলবেঁধে পানিতে নেমে নির্মল আনন্দ উপভোগ করে। পক্ষান্তরে শহরে শিশুরা এ সুযোগ পায় না বললেই চলে। কারণ বড়ো বড়ো শহরে পুকুর খুব কম থাকে, আর থাকলেও ওতে ময়লা আবর্জনার ভয়ে কেউ বাচ্চাকে নামাতে সাহস পায় না। এরপর স্কুলে

পড়াশুনার চাপে শিশুরা সারাবছরই ব্যতিব্যস্ত থাকে। এক্ষেত্রে সচেতন বাবা মায়েরা বছরের নির্দিষ্ট সময় গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার সুযোগে যখন বাচ্চাদের পুকুরে নামতে কিংবা সাঁতারের জন্য উদ্যোগ নিতে যান, ততদিনে শিশুর মাঝে জলভীতি শুরু হয়। আবার দশ বছর থেকে ওজন বাড়তে থাকার কারণে ভেসে থাকার জন্য যে কষ্ট করতে হয় অনেক শিশুরাই সেটা পারে না। এমনি করে দেখা যাচ্ছে আমাদের দেশের বর্তমান প্রজন্মের অধিকাংশ শিশুই সাঁতার জানে না।

পানি নির্মল আনন্দের উৎস। পানির সৌন্দর্য যেমন প্রত্যেককে বিমোহিত করে তেমনি পানিতে নামার আনন্দ বর্ণনাতীত। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষকে যাত্রাপথে পানি অতিক্রম করতে হয়। যিনি সাঁতার জানেন না তার জন্য এই যাত্রাপথ পুরোপুরি আনন্দের হয় না বরং মনের কোণে আশঙ্কা জেগে থাকে, এই বুঝি ডুবে গেলাম। আবার যেসব মানুষ সাঁতার শেখেনি, কোথাও বেড়াতে গেলে কিংবা পড়ালেখার জন্য দূরে গেলে ওদের বাবা মায়েরা সবসময় শঙ্কায় থাকেন। পানি ভীতি যেন সবার মনকে দুর্বল করে রাখে। কিন্তু অভিভাবকদের জানা দরকার, পানিতে ভেসে থাকার কৌশলটি শেখা জীবনের সবচেয়ে জরুরি কাজ।

আমরা অনেকেই মনে করি বাচ্চাদের লেখাপড়ার সময় অন্য কিছু করলে সময় নষ্ট হয়। কিন্তু বেঁচে থাকার জন্য পানিতে ভেসে থাকার কৌশল জানা পড়ালেখার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। গ্রীষ্মে যখন পুকুরে পানি কম থাকে এ সময়টাতে ছুটি নিয়ে বাচ্চাদের সাঁতার শেখাতে গ্রামের বাড়ি গেলে ওরা সাত দিনেই সাঁতার শিখে যায়। বাচ্চাদের সাথে নিয়ে পুকুরে নেমে প্রতিদিন একটু একটু করে চেষ্টা করলে আপনা থেকেই শিশুরা ভেসে থাকার আনন্দ পায়। আর যে-কোনো কাজ আনন্দের সাথে শিখলে তাতে সময়ও কম লাগে। বাবা-মা হিসেবে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে প্রতিটি অভিভাবকেরই উচিত শিক্ষার প্রথম পর্যায়েই শিশুকে সাঁতার শেখানো। সব শহরে সাঁতার শেখানো কেন্দ্র গড়ে তোলা দরকার। স্কুলের শিশুদের বাধ্যতামূলকভাবে সাঁতার শিখতে শিক্ষকদের উচিত উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি পরিচালনা করা। ক্রীড়া সংস্থার মাধ্যমে প্রতিটি জেলা ও উপজেলাতে শিশুদের সাঁতার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারলে তাদের জন্য ঝুঁকিমুক্ত ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

লেখক: সিনিয়র তথ্য অফিসার, আঞ্চলিক তথ্য অফিস, খুলনা

সচিত্র বাংলাদেশ এখন ফেসবুকে

ভিজিট করুন

www.facebook.com/sachitrabangladesh/

বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস

সানজিদা আহমেদ

হেপাটাইটিস হলো এক ধরনের যকৃতের প্রদাহ। দুই প্রকারের হেপাটাইটিস রয়েছে। যেমন: তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী। তীব্র হেপাটাইটিস প্রায় ৬ মাস স্থায়ী হতে পারে। অন্যদিকে দীর্ঘস্থায়ী হেপাটাইটিস দীর্ঘ কাল স্থায়ী হতে পারে।

২০১৫ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী বিশ্বজুড়ে প্রায় ৩২৫ লক্ষ মানুষ দীর্ঘ মেয়াদি হেপাটাইটিস রোগে ভুগছে। তবে ২০১৫ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী হেপাটাইপিস বি-র টিকা চালু হওয়ার পর শিশুদের মধ্যে হেপাটাইটিস সংক্রমণের হার ১.৩% কমেছে।

হেপাটাইটিস ভাইরাসের ৫টি ভাইরাস আছে। যেমন: এ,বি,সি,ডি এবং ই। নিচে ৫টি ভাইরাস নিয়ে আলোচনা করা হলো-

১। হেপাটাইটিস-এ(এইচ এ ভি): সাধারণত দূষিত খাদ্য ও পানির মাধ্যমে এটি হয়ে থাকে। এইচ এ ভি-র টিকা পাওয়া যায়।

২। হেপাটাইটিস-বি (এইচ বি ভি): আক্রান্ত মা থেকে গর্ভাবস্থায় শিশুর মধ্যে এটি দেখা দিতে পারে। হেপাটাইটিস-বি (এইচ বি ভির)-র টিকা পাওয়া যায়।

৩। হেপাটাইটিস-সি (এইচ সি ভি): সাধারণত সংক্রমিত রক্ত বা সূচ দ্বারা একটি হতে পারে। এটির টিকা পাওয়া যায় না।

৪। হেপাটাইটিস-ডি (এইচ ডি ভি): সংক্রমিত ব্যক্তির রক্ত ও রক্ত-রস থেকে এটি ছড়ায়। একা বা হেপাটাইটিস-বি ভাইরাসের সঙ্গে এটি দ্রুত ছড়িয়ে পারে। এটির টিকা পাওয়া যায়।

৫। হেপাটাইটিস-ই (এইচ ই ভি): দূষিত খাদ্য বা পানি থেকে এটি ছড়ায়। এর টিকা পাওয়া যায় না।

প্রতিবছর ২৮শে জুলাই বিশ্বব্যাপী হেপাটাইটিস দিবস হিসেবে পালিত হয়। এ দিবসটির লক্ষ্য হচ্ছে– সারাবিশ্বে হেপাটাইটিস এ, বি, সি, ডি ও ই সম্পর্কে জানা এবং রোগ নির্ণয়, প্রতিরোধ ও প্রতিকার সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা। প্রতিবছর গোটা বিশ্বে হেপাটাইটিসে আক্রান্ত হয়ে প্রায় ১.৪ মিলিয়ন লোক মারা যায়।

বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার জরিপে অন্যতম আটটি অফিসিয়াল পাবলিক হেলথের মধ্যে একটি। অন্যান্য দিবসসমূহ হলো– বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস, বিশ্ব রক্তদাতা দিবস, বিশ্ব ইম্যুনাইজেশন সপ্তাহ, বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস, বিশ্ব তামাক দিবস, বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবস এবং বিশ্ব এইডস দিবস। ভাইরাস হেপাটাইটিস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, উদ্যোগ, প্রতিরোধ ও প্রতিকারের জন্য 'বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস' পালনের লক্ষ্যে বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বে দিবসটি পালিত হচ্ছে। ভাইরাসটির আবিষ্কারক প্রয়াত মার্কিন নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক ব্রয়েলশ ব্রুমবার্গের জন্মদিন উপলক্ষে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে ২০১০ সাল থেকে দিবসটি পালিত হয়ে আসছে।

বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী পৃথক পৃথক বাণী প্রদান করেন।

রাষ্ট্রপতি বাণীতে বলেন, দিবসটি পালনের মাধ্যমে দেশের জনগণের মধ্যে হেপাটাইটিস বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। সরকার জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকেও এলক্ষ্যে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী বাণীতে বলেন, বাংলাদেশসহ বিশ্বে হেপাটাইটিস ভাইরাসজনিত রোগীর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ের জন্য জনগণের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সুবিধা নিশ্চিত করা জরুরি। ভাইরাস প্রতিরোধ, পরীক্ষা আর চিকিৎসার একটা লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করার মাধ্যমে ভবিষ্যতে হেপাটাইটিস ভাইরাস নির্মূল করা সম্ভব।

লেখক: প্রাবন্ধিক

বিশ্ব হেড-নেক ক্যান্সার দিবস

শাওন আহমেদ

হেড-নেক ক্যান্সার বলতে মুখ, গলা, সাইনাস ও থাইরয়েডের ক্যান্সারকে একত্রে হেড-নেক ক্যান্সার বলা হয়। মুখ, মুখ-গহ্বর, নাক, শ্বাসনালী, সাইনাস ও খাদ্য উপরিভাগসহ বিভিন্ন লালাগ্রন্থিও ক্যান্সারের অন্তর্গত। এই রোগের কারণ বেশিরভাগই ধূমপান জনিত। পান, সুপারি, জর্দাতে যারা অভ্যস্ত তাদের এই রোগ বেশি হয়ে থাকে। শিশুদের মধ্যে এই রোগের হার কম। ক্যান্সার রোগীদের মধ্যে শতকরা ৪০ থেকে ৪৫ ভাগ হেড-নেক ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে থাকে। সিলেট ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে আসা রোগীদের মধ্যে চালানো জরিপে দেখা যায়, গত এক বছরে হাসপাতালটির বর্হিবিভাগে ক্যান্সারের চিকিৎসা নেওয়া ৮ হাজার ৯২১ রোগীর মধ্যে হেড-নেক ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিল তিন হাজার ৮৩৬ জন। গত এক বছরে দেশে পুরুষদের মধ্যে এই রোগ বেশি দেখা যায়। বংশগত কারণেও কেউ কেউ হেড-নেক ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

হেড-নেক ক্যান্সার একটি নির্দিষ্ট বয়সের পড়ে ৩টি জিনিস দেখলেই এই রোগ সনাক্ত করা সম্ভব। মুখগহ্বরের ভিতরে ঝিল্লিতে লাল লাল ছোপ ছোপ দাগ যদি দেখা যায়, জিহ্বা বা মাড়ি বা ঝিল্লির মধ্যে সাদা খসখসের আস্তরের মতো হয় এবং ঝিল্লির নিচে ছোট দানার মতো ওঠে এবং পরে ঘা হয়ে যায়। এই তিনটি জিনিস কারো মুখের মধ্যে দেখা গেলে পরীক্ষার খুব প্রাথমিক অবস্থায় এই ক্যান্সার নির্ণয় করা যায়।

এই ক্যান্সারের চিকিৎসা ব্যয়বহুল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে হেড-নেক ক্যান্সার বিষয়ক একটি বিশেষায়িত শাখা রয়েছে। যেখানে এ ক্যান্সারের সবচেয়ে ভালো চিকিৎসা হয়। কেউ যদি ধূমপান বা তামাক ব্যবহার ছেড়ে দেয় তাহলে এই ক্যান্সারে আক্রান্ত হবে না। ধূমপান, তামাকজাত পণ্য ও মদপান পরিহারের মাধ্যমে এই ক্যান্সার থেকে দূরে থাকা যেতে পারে।

প্রতিবছর ২৮শে জুলাই বিশ্ব হেড-নেক ক্যান্সার দিবস হিসেবে পালিত হয়। এ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) বটতলা থেকে বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করে। বাংলাদেশ সোসাইটি অব হেড-নেক সার্জন্স এ র‍্যালির আয়োজন করে থাকে। র‍্যালি শুরুর আগে বিএসএমএমইউ'র অটোল্যারিংগোলজি হেড-নেক সার্জারি বিভাগের চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ সোসাইটি অব হেড-নেক সার্জন্স-এর সভাপতি অধ্যাপক ডা. বেলায়েত হোসেন সিদ্দিকী জানান, হেড-নেক ক্যান্সারের মধ্যে স্বরযন্ত্রের ক্যান্সার, মুখ গহ্বর ও খাদ্যনালীর উপরিভাগের ক্যান্সার, থাইরয়েডের ক্যান্সার, নাক ও সাইনাসজনিত ক্যান্সার রয়েছে।

এছাড়াও আরো কয়েকটি জটিল ক্যান্সার রয়েছে। মোট ক্যান্সারের মধ্যে ৩০ থেকে ৩৫ ভাগ হলো হেড-নেক ক্যান্সারের রোগী। এসব ক্যান্সার প্রতিরোধযোগ্য ও প্রাথমিক পর্যায়ে চিকিৎসা করা হলে পূর্ণ নিরাময় সম্ভব। এসব ক্যান্সার প্রতিরোধে ধূমপান পরিহার, পান-সুপারি, তামাক ও জর্দা বর্জন, খাদ্য অভ্যাস পরিবর্তন বিশেষ করে অ্যালকোহল জাতীয় খাবার পরিহার করতে পারলে এ রোগ থেকে নিরাময় পেতে পারেন।

লেখক: প্রাবন্ধিক

তোমাকে চাই

হেলাল হাফিজ

আমি এখন অন্য মানুষ ভিন্নভাবে কথা বলি
কথার ভেতর অকথিত অনেক কথা জড়িয়ে ফেলি
এবং চলি পথ বেপথে যখন তখন।
আমি এখন ভিন্ন মানুষ অন্যভাবে কথা বলি
কথার ভেতরে অনেক কথা লুকিয়ে ফেলি,
কথার সাথে আমার এখন তুমুল খেলা
উপযুক্ত সংযোজনে জীর্ণ-শীর্ণ শব্দমালা
ব্যঞ্জনা পায় আমার হাতে অবলীলায়, ঠিক জানি না পারস্পরিক খেলাধুলায়
কখন কে যে কাকে খেলায়।
অপুষ্টিতে নষ্ট প্রাচীন প্রেমের কথা যত্রতত্র কীর্তন আমার
মাঝে মধ্যে প্রণয়বিহীন সভ্যতাকে কচি প্রেমের পত্র লিখি
যেমন লেখে বয়ঃসন্ধি কালের মানুষ নিশীথ জেগে।
আমি এখন অন্য মানুষ ভিন্নভাবে চোখ তুলে চাই
খুব আলাদাভাবে তাকাই
জন্মাবধি জলের যুগল খলস দেখাই,
ভেতরে এক তৃতীয় চোখ রঞ্জরালোয় কর্মরত
সব কিছু সে সঠিকভাবে সবটা দেখে এবং দারুণ প্রণয় কাতর।
আমি এখন আমার ভেতর অন্য মানুষ গঠন করে সংগঠিত,
বীর্যবান এক ভিন্ন গোলাপ এখন খুব প্রয়োজন।

ও নদী পাগল

সৈয়দ শাহরিয়ার

কতবার তরী বের করে
বাইতে পারে না পড়ে থাকে ঘাটে
একবার
ভেলায় দাঁড়ানো টলোমলো বর্ষা বিদ্ধ
হাত পাকেনি তখনো চিনে নিতে হতো
ডিঙি, ছিপ, বজরা, পানসি...
ময়ূরপঙ্খির ঢেউ তোলা স্বপন ভাসে
বাইতে যাওয়া গাঙে
ঢের জানে কত পরে
নদীর এখন ভাবে–ভরা দিন কাল
চলে না দু'হাত মেলে স্রোত সুখী পাড়ে
বন্ধু প্রেমে মজে বালুর কাফন তলে!
মন মাঝির রোদন
ধু-ধু হাওয়ার ফেরে
খুঁজে বেড়ায় হারাণ দাস চকে চকে
খোয়াজ খিজিরের সীমা দেওয়া আশা
পেলে দাগ টেনে দিলে ধারা বয়ে যাবে!
কায়েমি চরের জেলে হাসি জ্বলে রোদে
গা ছাড়া জেলেরা জানে ও নদী পাগল!

হায়েনার থাবা

নাসিম সুলতানা

নাজমার সেই ফেলে আসা দিনটির কথা মনে পড়লে আজও শরীরে কাঁটা দিয়ে ওঠে। ওহ... কী যে ভয়ানক বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছিল। কুংফু ক্যারাট জানার এবং বুদ্ধির বিচক্ষণতার কারণে সেদিন তার ইজ্জতটা রক্ষা করতে পেরেছিল।

বাবা-মা'র একমাত্র মেয়ে নাজমা। ছোটোবেলায় অনেক আদরে বড়ো হয়েছে। নাচের ক্লাস, গানের ক্লাস, কুংফু ক্যারাটি ক্লাস সবই লেখাপড়ার পাশাপাশি শিখতে হয়েছে। খেলাধুলায়ও সে অনেক ভালো ছিল। একটু বড়ো হতেই নাচ ও গানের ক্লাস বাদ দিতে হলো।

নাজমার বাবা একদিন তার মা'কে বললেন, শোন রাহেলা, মেয়েকে এত কিছু শিখায়ও না। লেখাপড়ার পাশাপাশি কুংফু ক্যারাটি শিখাও। লেখাপড়াটা ওর ভবিষ্যতের জন্য আর কুংফু ক্যারাটি ওর বিপদ্-আপদের জন্য।

মা আর কী করবেন। মেয়ের গান, নাচ সব বাদ গেল। নাজমার অবশ্য লেখাপড়ার প্রতি যেমন আগ্রহ ছিল, তেমন আগ্রহ ছিল খেলাধুলার প্রতিও। সাঁতার কাটা থেকে শুরু করে যে-কোনো খেলাধুলায় সে প্রথম হতো। ষষ্ঠ শ্রেণিতে উঠেই তার শুরু হলো কুংফু ক্যারাটি শিখা।

দিন এভাবে সামনে এগিয়ে যেতে থাকলো। ছোটোবেলা থেকে নাজমার আগ্রহ ছিল ডাক্তার হওয়ার। বিজ্ঞান গ্রুপ থেকে তার রেজাল্ট ভালো হলো না। অতএব মানবিক শাখায় তাকে পড়তে হলো।

শেষ পর্যন্ত লেখাপড়া শেষ করে তার পেশা হলো শিক্ষকতা। একটা প্রাইভেট কলেজে শিক্ষকতার চাকরিও পেয়ে গেল।

দেখতে শুনতে সুন্দরী হওয়ার কারণে বিয়েটাও ভালোভাবেই হয়ে গেল। স্বামী রাহুল ব্যবসা করেন।

বাবা-মা, আত্মীয়স্বজন নিয়ে ভালোভাবেই তার দিন কাটছিল। কুংফু ক্যারাটে অতি বিচক্ষণ হওয়ার জন্য সে মেয়েদের জন্য একটা ট্রেনিং সেন্টারও দিল।

এভাবে ভালোভাবেই তাদের দিন কেটে যাচ্ছিল। তার শ্বশুর ও

শাশুড়ি দেশের বাড়িতে থাকেন। তারাও মাঝেমধ্যে এখানে বেড়াতে আসেন। এর মধ্যে তাদের সন্তান জয় ঘর আলো করে জন্ম নিল।

সকালে কলেজ, বিকালে ট্রেনিং সেন্টার ও তার মধ্যে বাচ্চা সামলানো এবং সংসার সব মিলিয়ে নাজমা হাঁফিয়ে উঠল। দিনতো আর বসে থাকে না। মেঘে মেঘে অনেকগুলো বছর চলে গেল।

তাদের সন্তানকে এখন স্কুলে ভর্তি করার সময় হয়েছে। যাক জয়ের বাবা'র ইচ্ছাতেই নাজমার কলেজের পাশে একটা কিন্ডার গার্ডেন স্কুলে ছেলেকে ভর্তি করে দিল।

নাজমাই ছেলেকে আনা নেওয়া করে। কলেজের ব্যস্ততার কারণে নাজমা জয়কে স্কুলের ভিতরে ঢুকিয়ে কর্মস্থলে চলে যায়। আবার ছুটির বিশ মিনিট আগে ছেলেকে নিতে আসে। এই অল্প সময়ে স্কুলে যেসব গার্ডিয়ান আসে তাদের সাথে নাজমার পরিচয় হয়।

এর মধ্যে দিপা নামে একটা মহিলার সাথে তার পরিচয় হয়। এ পরিচয় বেশ আন্তরিকতায় পরিণত হয়।

এভাবে বছর যেয়ে নার্সারি থেকে শিশু শ্রেণিতে উঠল তাদের আদরের সন্তান জয়।

ঐদিন নাজমার কলেজ বন্ধ ছিল। তাই আজ একটু সকাল সকাল স্কুলে এসেছে। সে দেখে দিপা স্কুলের গেটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। দিপা একটু বেশি সেজেগুজে আসে। নাজমা এটা খুব অপছন্দ করে। সে অতি সাধারণভাবে চলাফেরা করে। সিম্পল সালোয়ার কামিজ ও ওড়না এই তার ড্রেস। নাজমা প্রত্যেক দিন গাড়ি নিয়ে আসে। আর আজকে সে রিকশায় এসেছে।

দিপা তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেখে নাজমা বলল, ওভাবে কী দেখছেন?

দিপা বলল, আপনি দেখতে খুব সুন্দর। গোলাপি ড্রেসে আপনাকে খুব সুন্দর লাগছে। চলেন না বেড়িয়ে আসি। আমার বাসা এই তো সামনেই।

নাজমা বলল, না ভাই, বাচ্চার স্কুল ছুটি হয়ে যাবে। দিপা বলল, আরে... ছুটি হবার আগেই আমরা চলে আসব।

নাজমা মনে মনে ভাবল, এত করে যখন বলছে তখন যাই। এখনো স্কুল ছুটি হতে আধা ঘণ্টার বেশি বাকি আছে!

স্কুলের কাছে দুই-তিনটা গলির পর একটা চারতলা বাড়ির এক তলায় এসে দিপা থামল। তারপর কলিং বেলের শব্দে একজন সুদর্শন যুবক দরজা খুলে দিল।

দিপাকে দেখে যুবকটি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল আরে দিপা তুমি? আসো... আসো। আমি তো তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।

নাজমা ওদের কথায় বিস্ময়ে অবাক হয়ে যায়। দিপা এখানে আসার কথা থাকলে তাকে আনল কেন? তার ঘোর না কাটতেই দিপা হেসে দিয়ে নাজমার দিকে তাকিয়ে যুবকটির সাথে পরিচয় করিয়ে দিল– আমার ভাই রাশেদ, ইঞ্জিনিয়ার।

নাজমা কিছু বলার আগেই রাশেদ বলল, আপনার কথা অনেক শুনেছি। আপনি খুব ভালো শিক্ষিকা।

যুবকটির কথায় নাজমা আরো একটু অবাক হলো। সে ভাবলো দিপা কেন এই অপরিচিত যুবকের সাথে তার কথা আলোচনা করেছে?

নাজমা স্মিত হাসি দিয়ে বলল, এ আর বেশি কি? কিন্তু তার যে আর একটি পরিচয় আছে কুংফু ক্যারাটের শিক্ষক তা আর সে বলল না।

দিপা তাদেরকে বসিয়ে চা আনতে গেল। নাজমা কেমন যেন বিরক্ত বোধ করতে লাগল। সে খেয়াল করল রাশেদ হায়েনার মতো তারই দিকে বার বার লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। নাজমা চারদিকে তাকিয়ে দেখল ঘরের পর্দাগুলো দামি। এপাশে-ওপাশে ভালো করে তাকাতেই খেয়াল করল পর্দার সাথে ক্যামেরা ফিট করা আছে। নাজমার মনটা এক অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠল। তার আর বুঝতে বাকি থাকল না যে, সে ভয়ানক বিপদে পড়েছে। সে হায়েনার নামে এক হিংস্র জন্তুর খাবারের শিকার হয়েছে। রাশেদ কথা বলতে বলতে হঠাৎ দরজাটা বন্ধ করতে গেল।

নাজমা ভয়ানক বিপদ বুঝতে পেরে মুহূর্তের মধ্যে কুংফু ক্যারাটের নিয়মে রাশেদের কোমর বরাবর খুব জোরে এক লাথি মারল। এক লাথিতেই সে কুপোকাত। ক্যাক করে আওয়াজ করে সে মাটিতে পড়ে গেল। রাশেদ কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই নাজমা দরজা খুলে এক দৌড় দিল। দৌড়াতে দৌড়াতে সে একটা গলি পার হয়ে রিকশা নিল। হাঁপাতে হাঁপাতে সে এই বীভৎস ভয়ানক বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য আল্লাহকে বার বার ধন্যবাদ জানাল। আজ সে বুঝতে পারছে তার কুংফু ক্যারাটের জন্য কী ভয়ানক বিপদ থেকে উদ্ধার পেল।

তার শরীর কাঁপতে শুরু করেছে। পিপাসায় গলা শুকিয়ে গেছে। সে রিকশাওয়ালাকে বলল, একটু জোরে চালাও। দোকানে দাঁড়িয়ে যে এক বোতল পানি কিনবে তা আর মন চাইছে না। কারণ জয়ের স্কুল ছুটি হতে আর বেশি সময় নেই।

নাজমা ভাবছে উফ্ কী ভয়ানক বিপদ থেকে যে রেহাই পেল তা সে ভাবতেই পারছে না।

সে কি পুলিশকে খবর দিবে! নাকি তার স্বামীকে বলবে। না... না... এই জঘন্য কলুষিত কথা কাউকেই বলতে পারবে না। কি যে বোকা লাগছে নিজেকে। কেন সে ঐ মহিলার কথাতে গেল। সারারাত সে ঘুমাতে পারল না।

তার শুধু মনে পরছে কয়দিন পূর্বে পেপারের নিউজটির কথা। বাসের ড্রাইভারসহ হেলপাররা মিলে একজন মেয়েকে ধর্ষণের পর বাস থেকে ফেলে মেরে ফেলেছিল। কী ভয়ংকর কথা। মেয়েটি যদি কুংফু ক্যারাটি জানতো তো প্রাণে রক্ষা পেতেও তো পারতো? এজন্য প্রত্যেক মেয়েদের আত্মরক্ষার জন্য কুংফু ক্যারাটি শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। আর এটা স্কুল থেকে শুরু করা দরকার।

পরদিন স্কুলে তার স্বামীকে নিয়ে আসল। অন্যদিন গাড়ি থেকে নাজমা একা নেমে যায়। আর আজ দুজনে গাড়ি থেকে নামল। নাজমা খেয়াল করল দিপা মেয়েটি আশপাশে কোথাও নেই।

তাহলে কি মেয়েটি ধাপ্পাবাজ। এভাবে সহজেই সহজ-সরল মেয়েদের নিয়ে ধুম্রজালে আটকায়? এভাবেই তারা অসৎভাবে মেয়েদেরকে পর্নোপণ্য হিসেবে ব্যবসা করে।

আজ নাজমা কুংফু ক্যারাটি জানতো বলে ইজ্জতটা রক্ষা করতে পারল। তা না হলে যদি সাধারণ মেয়ে হতো তো কি যে ভয়ানক বিপদ হতো।

নাজমা ঐ বাড়িতে যেয়ে খোঁজ করতেই জানতে পারল যে, ঐ বাসাটিতে টু-লেট দেওয়া হয়েছে। তার মানে তারা সব পালিয়েছে।

নাজমা মনে মনে ঠিক করল জয়ের স্কুলে যখন যাবে, তখন এই মহিলাটিকে খোঁজ করে দেখবে। কিন্তু কত দিন চলে গেল মহিলাটিকে আর খুঁজে পেল না।

দেখতে দেখতে অনেকগুলো বছর পার হয়ে গেল। জয় এখন ডাক্তারি পড়ে। নাজমারও এখন অনেক বয়স হয়েছে। কিন্তু অতীতের সেই ভয়ানক বিপদের মুহূর্তটা আজও নাজমার মনে হলে শরীরে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

লাবণ্যের অপেক্ষায়

জাকির হোসেন চৌধুরী

লাবণ্য– এই চোখজুড়ে আধার
কথা ছিল বসন্ত উল্লাসে আসবে তুমি
সব বাধা পেরিয়ে একলিসের ঘোড়ায় চেপে
আমাদের বেদনার অঙ্ক ফুরাবে
এই ধূলি ধুসর শ্যামল বাংলায়
হাজার নদীর উজান স্রোতে
কোটি মানুষের চোখের আলোয়
ভেসে বেড়াব আমরা
লাবণ্য কথা ছিল দেখা হলে
এক সাথে খাব দুজনে
সাঁঝের বেলায় নদীর ধারে বেড়াতে যাব
সুতো বিহীন ঘুড়ি ওড়াবে
সূর্য শ্যামল মাঠে
যুদ্ধ শেষে দিন বদলের খেলায়
আমরা যেন সব ভুলে গেছি
আজ এই চোখজুড়ে শুধু অন্ধকার
তুমি আসবে– অপেক্ষায় তোমার।

অন্ধকার ভালো লাগেনি তোমার

সোহরাব পাশা

দীর্ঘ অন্ধকার ভালো লাগেনি তোমার
ভোরের দরোজা খুলে পাখিদের আগে
শুনিয়েছো তুমি মুখর রৌদ্রের গান,
পৃথিবীর নিজ আয়োজন।
ছেঁড়া মেঘের পাতার নিচে নিম্নমুখী যে জীবন
অন্ধ, মৃত বাসনায় যারা খুঁজে ফেরে
জ্যোৎস্নার শিশির স্বপ্নভোর-রাত্রি শেষে
কালি-ঝুলি মাখা কয়লার পাশে হঠাৎ ঘুমিয়ে
পড়া ক্লান্তির জীবন, অজস্র মেঘলা কুয়াশার
ভিড়ে যারা আকাশ দেখতে ভুলে যায়
তুমি ওই সব মানুষের বিপন্ন বিষণ্ন গূঢ়
জীবনের বিনয়ের তীব্র দ্যুতি উজ্জ্বল অম্লান
তুমি জেগে আছো প্রতি ভোরে
সকাল-সন্ধ্যায়, বিনিদ্র রাত্রির চোখে
মানুষের মন ও মননে
প্রেম ও বিপ্লবে জ্যোতির্ময়
ল্যাম্পপোস্ট কবি নজরুল।

বৃষ্টির পদাবলি

মুহাম্মদ ইসমাঈল

আমি একটি বৃষ্টির পদাবলি লিখব
বৃষ্টির না অন্য কিছুর
নাকি প্রেমের পদাবলি
নাকি দেশের পদাবলি
নাকি সাম্যের, নাকি গর্জনের
না আমি বৃষ্টির জন্য।
বৃষ্টি সবকিছু ধুয়ে মুছে নিয়ে যায়
বৃষ্টি সবকিছু পরিষ্কার করে ফেলে, বৃষ্টিই সবকিছু।

একরোখা স্মৃতি

আতিক আজিজ

পায়ের তলায় নিচে তাঁত ঝিমিয়ে আসে
যেন মাইল মাইল বালির ওপর সন্ধ্যে নামছে,
মনে করি আমার পথ ভাঙা শেষ হলো
এক চিলতে জলে পাতার গুচ্ছ একটা নক্ষত্র।
দুলে উঠে আকাশের আয়নায় তোমার মুখ
যেদিকে ঘোরাই তোমারই মুখ,
অন্ধকার যখন ঘনিয়ে আসে
দেখি সে আমার উৎসবের অন্ধকার নয়।
তুমি সেখানে বিচ্ছুরিত হও না
আমার ওপর কালো পাহাড়ের চাপ,
আর সারাটা রাস্তার রোদ্দুরের যন্ত্রণায়
আমি নিবন্ধ থেকে যাই।
ইঞ্জিনের গরগর ধুলো ছেড়ে উঠে এসে
মাথার উপরে ঘোরে রোগা রোগা হাতে যে,
সানকিগুলো ধরা ছিল তারা আমার
চারদিকে বাতাস জ্বালিয়ে ছোটে।
নির্জন নয়, উতরোল নয়
বুকের ভিতরে একরোখা স্মৃতি,
এবং এত পতন শূন্যে
আমি হয়ত তোমার কাছেই এসে গিয়েছি
কাছে, কিন্তু অগ্নিবলয়ের ওপারে।

নদী যখন বইতো দেশে

সৈয়দ লুৎফুল হক

নদী যখন বইতো দেশে
গাইতো সুরে গান,
কামার, কুমার, কৃষককুলের
জাগিয়ে দিত প্রাণ।
কাক ভোরে রাখাল যখন
গরু নিয়ে মাঠে,
খেয়া পাড়ে ছাতিম তলায়
পথিক বসে ঘাটে।
গয়না পড়ে গাঁয়ের বধূ
শ্বশুর বাড়ি যায়,
উজান জলে দাঁড় টেনে
মাঝিরা গান গায়।
উজান ভাটি ছিল জলে
জলের সীমা নাই,
শুশুক ভেসে করত খেলা
দেখতে নাহি পাই।
পদ্মা, মেঘনা, গঙ্গায়, যমুনায়
শুকিয়ে গেছে জল
এক সময়ে এই নদীর
ছিল নাতো তল।
দখল করে নদী এখন
করছে নদী শাসন
নদী বাঁচাও বলে এখন
দিচ্ছে নানান ভাষণ।

ফুলবিবির স্বপ্ন

রেহানা

আলোচ্য বিষয় নারী ও শিশু
গণপরিবহণে কিংবা ঘরে ও বাইরে।
কেন এ শিশু তোমার কোলটি জুড়ে নেই?
এ নারী মা নয় কিংবা সহোদরা?
বাজপাখির ধারালো নখের বিষে বারে বারে নীল
হয়ে যায় বঙ্গোপসাগরের হৃদয়।
ঢাকায় আসেন ফুলবিবি, সঙ্গে আত্মজাকে নিয়ে
কোলাহল আর বিষাক্ত ছোবলে হারিয়ে
ফেলেন নয়নের মণিকে।
কোলহারা সে। তার আত্মজা
কি শিকার হয়েছে বিষাক্ত বাজপাখির নখরে?
পিষ্ট হয়েছে চলন্ত যন্ত্র দানবের রোষে?
তবুও স্বপ্ন দেখেন ফুলবিবি
বিচারহীনতার সংস্কৃতি তো দূর হয়েছে সেই কবে।
পুবের আকাশে–
একরাশ আত্মবিশ্বাস আর সোনালি সম্ভাবনা
নিয়ে জেগে আছে বাংলাদেশ।

আমার প্রাণের সোনার বাংলাদেশ

নুসরাত জাহান

কী অপরূপ রূপের মাধুরী মিশানো
আমার প্রাণের এই সোনার বাংলাদেশ
চারদিকে ছড়ানো ছিটানো হাজারো
নদী আর পাখির কলতানে ভরা।
আমার এই সবুজ সোনার বাংলাদেশ
সত্যিই আমি তোমায় ভালোবাসি।
আমার করুণাময়ী মায়ের সুখের হাসির মতো
সোনালি ধানের দোলায় দোলানো
আমার এই সোনার বাংলাদেশ।
হাজারো আউল, বাউল আর লালনের এই বাংলাদেশ
সত্যিই ভালোবাসার যেমন অভাব নেই
আমার দেশের মতো এমন পাখি ডাকা ভোর
পৃথিবীর আর কোথাও আছে বলে আমার মনে হয় না।
তাই তো আমি এই দেশের প্রেমে মুগ্ধ
আর কোথাও যেতে চাই না।
শত জনমের লাখো মানুষের ভালোবাসায়, মায়ায় জড়ানো
আমার এই সোনার বাংলাদেশ আমি তোমার প্রেমে মগ্ন।
লাখো শহিদের রক্তের বিনিময়ে পাওয়া
আমার এই সোনার বাংলাদেশ।
এই দেশে জন্মে এই দেশে বড়ো হতে পেরে
সত্যিই আমি ধন্য।
হাজার বছরের বাঙালির প্রেমে সিক্ত
আমার এই সোনার বাংলাদেশ।
সত্যিই আমি তোমায় ভালোবাসি
ভালোবেসে মরে যেতে চাই।

বর্ষা আসে

চিত্তরঞ্জন সাহা চিতু

বর্ষা আসে এই বাংলায়
বৃষ্টি পড়ে টুপ
হই চইটা আর থাকে না
সব যেন হয় চুপ।
বর্ষা আসে টাপুরটুপুর
সোনা ব্যাঙের গান
গানের সুরে খোকাখুকুর
অমনি ভাঙে মান।
বর্ষা আসে নৌকাগুলো
চলে স্রোতের তালে
বৃষ্টি তখন ঝড়তে থাকে
গাছের ডালে ডালে।
বর্ষা আসে দাদুর মুখে
মজার গল্প ছোটে
সেই খুশিতে কদম গাছে
হাজারো ফুল ফোটে।

নিস্তব্ধতা

রুমী ইসলাম

নিস্তব্ধতায় আমি তোমাকে খুঁজে পাই
কাছে আরো কাছের করে
যেখানে শুধু আমি আর তুমি।
লোকালয়ে আমি তোমাকে হারাই
বার বার হারায়ে ফেলি
কোন দূর পরদেশে।
নিস্তব্ধতায় আবার খুঁজে পাই
আমার আপন সত্তাকে
যে সত্তা আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে
এই মানবতাহীন ধরণিতে।

বনবিথীরায়

দেলোয়ার হোসেন

পাহাড়ের নিচে ঝর্ণা ঝরার গান
সবুজ গুল্মলতা কাঁপে থরো থরো
কে তুমি একাকী এই নির্জনে
ঝুম ঝুম ঝর্ণার জলে কলসি ভরো।
খুব চেনা
তার মুখ ভাসে হৃদয়ের জানালায়
ও মেয়ের নাম তো বনবিথীরায়
বলাকারা ফিরছিল নীড়ে আকাশ কি নীল
একদিন দেখেছিলাম তাকে
রাঙা ঠোঁটের নিচে কী অপরূপ কালো তিল
হাতের ছোঁয়ায় কেঁপেছিল তার শরীর
সাদা পাথরের নিচে
বিদায় বেলা সূর্য জ্বেলেছিল আলো
রাজপথে কালো পিচে।

বর্ষার রূপ

মো. জাহাঙ্গীর আলম

বর্ষাকালে গগনপানে
কালো মেঘে ঢাকা,
ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টি পড়ে
যায় না ভালো থাকা।
বৃষ্টি স্রোতে রাস্তাঘাটে
জমে কাদামাটি,
চলাফেরায় কষ্ট লাগে
নয়তো পরিপাটি।
আকাশ ডাকে গুড়ুম গুড়ুম
প্রায়ই বৃষ্টি আসে,
সবুজ শ্যামল সোনার দেশে
নতুন জলে ভাসে।
ছোট্ট ছোট্ট সোনামণির
স্কুল যাওয়া কষ্ট,
দুস্থ লোকের ছোট্ট চালা
হয় যে আরো নষ্ট।
বর্ষাকালে নদীনালা
নতুন জলে থইথই,
গাঁয়ের লোকে মাছ ধরিতে
করে কত হইহই।

জীবন্ত গতিবিধি

আ. আউয়াল রনী

আগমনের প্রত্যাশায়,
সুখ-আনন্দের প্রহর গুণায়।
হয়ত বা কারো জন্য সুখ–
হয়ত বা কারো জন্য দুঃখ।
জীবন যুদ্ধের জয়-পরাজয়ে–
যুদ্ধের রণক্ষেত্রে দুখ-সুখ যন্ত্রণালয়ে
কখনো উল্লাস, কখনো সর্বনাশ–
কখনো নিয়তি পড়ার স্বর্গ বাস।
কর্মস্থল কিংবা বাসস্থান,
একদিনে আনন্দ উল্লাস।
অপরদিকে কান্নায় আসে জল,
যেখানে দীর্ঘদিন ছিল বসবাস।
গড়ে ওঠা স্বজনপ্রীতির ভালোবাসা–
হৃদয় ভাঙা তোলপাড়ে আলিঙ্গনকে জড়ায়।
তবুও যে, যেতে হবে,
নিয়ম নীতি বিধানের টানে।
মায়ার জগত মিল করে,
কূলের ঠিকানার পানে।
পৃথিবীতে আসার খবর তুলে
কে কার আগে আসবে প্রতিযোগী হয়
প্রতিযোগিতায় যে জয়ী হয়
সেই আসে মায়ের কোলে।

বিশ্বাসেরই নাম

জাহানারা জানি

তুই যে আমার দখিনা হাওয়ায় কনকচাঁপার ঘ্রাণ,
মধুমতির বুকে তুই যে সুখেরই সাম্পান।
তুই যে শ্যামল মাঠের বাঁকে রাখালিয়া গান,
মন মাতানো দেশটা আমার, পরানের পরান।
এমন সোনার দেশ কিনেছি
অনেক প্রাণের দামে, আমার বুকের নিশ্বাস
আসে যায় তোমার মধু নামে
আমি কত তোমায় বাসি ভালো
যায় না বলা গানে, মাগো তোমার ধরি চরণ
দাও না আশিষ প্রাণে
তোমার জন্য কান্দি হাসি করি অভিমান
তোমার জন্য দিতে পারি তুচ্ছ জীবন দান
ও সোনার দেশরে তুই যে আমার
বিশ্বাসেরই নাম।

প্রতীক্ষা

আপন চৌধুরী

একজন কবির প্রতীক্ষা
সুন্দর কবিতার জন্য।
একজন সুরকারের প্রতীক্ষা
অমর কোনো সুর সৃষ্টির জন্য।
একজন শিল্পীর প্রতীক্ষা
ভালো চিত্রকল্পের জন্য।
একজন বক্তার প্রতীক্ষা
আকর্ষণীয় ভাষার জন্য।
একজন তৃষ্ণার্তের প্রতীক্ষা
একগ্লাস জলের জন্য।
একজন নারীর প্রতীক্ষা
প্রিয়জনের সান্নিধ্যের জন্য।
একজন মায়ের প্রতীক্ষা
একটি শিশুর জন্য।
একটি রাতের প্রতীক্ষা
আলোকিত প্রভাতের জন্য।
একটি গোলাপের প্রতীক্ষা
কোনো এক প্রেমিকের জন্য।
আর আমার প্রতীক্ষা
উন্নত বাংলাদেশ দেখার জন্য।

স্মৃতিতে অম্লান

সোহেল রানা

সময়ের সাথে সময়ে, আর চেনা মানুষেরাও
কেমন যেন অচেনা হয়ে যায়
তবুও এই হৃদয় কেন যেন ঘুরে ফিরে
সেখানেই তাকায়
রং চটা ছবি যেমন হৃদয়ে শিহরণ জাগায়
মুছে যাওয়া দিনগুলোও তেমনি
হৃদয় থেকে যায় না মুছে।

কৃষি শুমারির আওতায় ৯ই জুন ২০১৯ বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এসময় পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান উপস্থিত ছিলেন-পিআইডি

রাষ্ট্রপতি : বিশেষ প্রতিবেদন

ব্যক্তিগত কৃষির তথ্য দিলেন রাষ্ট্রপতি

কৃষি শুমারি ২০১৯ উপলক্ষে নিজের কৃষি পণ্যের তথ্য-উপাত্ত প্রদান করেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ। ৯ই জুন বঙ্গভবনে পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নানের উপস্থিতিতে তিনি এ তথ্য-উপাত্ত দেন। এসময় রাষ্ট্রপতি বলেন, দেশে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কৃষি শুমারি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। শুমারি চলাকালে প্রকৃত ও সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে গণনাকারীদের উপদেশ দিয়ে তিনি বলেন, কৃষি শুমারি বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি ত্বরান্বিতকরণে যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করবে।

তিনি বলেন, শিশুদের অসুস্থ প্রতিযোগিতার দিকে ঠেলে দেবেন না। অসুস্থ প্রতিযোগিতা তাদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত করে।

রাষ্ট্রপতি অভিভাবকদের পরামর্শ দিয়ে আরো বলেন, শুধু জিপিএ-৫-এর পেছনে না ছুটে শিশুদের জন্য প্রকৃতি থেকে শিক্ষা লাভের এবং প্রয়োজনীয় মানবিক মূল্যবোধের সঙ্গে বেড়ে ওঠার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এছাড়া শিশুদের সকল ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে হবে। তাহলেই শিশুরা দেশ ও জাতির জন্য মূল্যবান সম্পদ হিসেবে গড়ে উঠবে। ছাত্রজীবনের শুরু থেকেই স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশ ঘটানোর ওপর গুরুত্বারোপ করে শিশুদের উদ্দেশে রাষ্ট্রপতি বলেন, তোমাদের অবশ্যই দেশকে ভালোবাসতে শিখতে হবে। কখনো অন্যায় ও অসত্যের সঙ্গে আপোশ করবে না। এবারের আয়োজনে রাষ্ট্রপতি ২৩৭ জন বিজয়ীর মধ্যে ৩০ জনের মাঝে পুরস্কার ও পদক বিতরণ করেন।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মিলনায়তনে ১২ই জুন ২০১৯ জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানে শিশুদের মাঝে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ-পিআইডি

শিশুদের পড়াশোনার জন্য চাপ দেবেন না

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ শিশুদের পড়াশোনার জন্য চাপ না দিতে এবং তাদের প্রতিভা বিকাশের জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানান। ১২ই জুন বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মিলনায়তনে 'জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা-২০১৯' অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি এ কথা বলেন। এসময়

ধূমপান পরোক্ষভাবে অধূমপায়ীদের ক্ষতিগ্রস্ত করে

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ তামাক ও ধূমপান সংক্রান্ত আইন ও বিধি-বিধানের সঠিক প্রতিপালন নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান। বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষে ৩০শে মে এক বাণীতে তিনি এ কথা বলেন। 'বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস'

পালনের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, তামাকমুক্ত দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য 'তামাকে হয় ফুসফুস ক্ষয়, সুস্বাস্থ্য কাম্য তামাক নয়'– যথার্থ হয়েছে বলে মনে করেন তিনি।

রাষ্ট্রপতি বলেন, তামাক ও ধূমপান ধূমপায়ীদের পাশাপাশি পরোক্ষভাবে অধূমপায়ীকেও সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আর তামাকের কারণে পৃথিবীতে প্রতিবছর ৭০ লাখেরও বেশি মানুষ অকালে মারা যায়। রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, তামাক ব্যবহারজনিত অসুস্থতা দেশের চিকিৎসা সেবার ওপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। তাই তামাক প্রতিরোধে সমাজের সর্বস্তরে এর ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা অত্যন্ত জরুরি।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

দেশি ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তের বিরুদ্ধে এসএসএফ-এর সদস্যদের সবসময় প্রস্তুত থাকার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৫ই জুন এসএসএফ-এর ৩৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এসএসএফ-এর সদস্যদের প্রশংসা করে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৫ই জুন ২০১৯ এসএসএফ অফিসার্স মেসে স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্সের ৩৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বক্তৃতা করেন–পিআইডি

বলেন, নানা ধরনের প্রতিকূল অবস্থা বার বার সৃষ্টি হয়েছে। এসব চক্রান্ত মোকাবিলা করে দেশের গুরুত্বপূর্ণ মানুষের নিরাপত্তা দেওয়া কঠিন চ্যালেঞ্জ। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এসএসএফ সবসময় অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে আসছে। তিনি এসএসএফ-এর আনুগত্য ও উচ্চমানের পেশাদারিত্বে গর্বিত বলে উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী দেশি ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তের বিরুদ্ধে সবসময় প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেন। তিনি আরো বলেন, এসএসএফ-এর মতো একটি প্রতিষ্ঠান, তাদের সবসময় আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে। এলক্ষ্যে প্রযুক্তি আধুনিকায়নের প্রয়োজনীয়তা এবং উন্নত প্রযুক্তি বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন প্রধানমন্ত্রী।

সেনাবাহিনীকে সবসময় জনগণের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৬ই জুন ঢাকা সেনানিবাসে সেনাসদর নির্বাচনি পর্ষদ ২০১৯-এর সভায় অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী সেনাবাহিনীকে সবসময় জনগণের পাশে দাঁড়ানোর জন্য এর নেতৃত্বে যোগ্য এবং দেশপ্রেমিক অফিসারদের হাতে ন্যস্ত করার আহ্বান জানান। তিনি আশা প্রকাশ করেন, নির্বাচনি পর্ষদ পদোন্নতির জন্য এমন সব সেনা কর্মকর্তাদের সুপারিশ করবে যাদের দেশপ্রেম, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাস, নেতৃত্বের যোগ্যতা, পেশাগত দক্ষতা, শৃঙ্খলা, সততা, বিশ্বস্ততা এবং আনুগত্য রয়েছে।

ট্যারিফ কমিশন আইন ২০১৯-এর অনুমোদন

ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় বৈষম্য সৃষ্টি করতে পারে এমন সব তথ্য গোপন রাখার বিধান যুক্ত করে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০১৯-এর খসড়ায় চূড়ান্ত অনুমোদন দেয় মন্ত্রিসভা। একইসঙ্গে প্রস্তাবিত ট্যারিফ কমিশন আইনের নাম পরিবর্তন করে 'ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন' করা হয়েছে। ১৭ই জুন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে আইনটির চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়।

বিমানবন্দরে ডগ স্কোয়াড রাখার নির্দেশ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৮ই জুন এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় প্রধানমন্ত্রী ৮ হাজার ৫৩ কোটি টাকা ব্যয়ের ১১টি প্রকল্পের অনুমোদন দেন। দেশের বিমানবন্দরে অধিকতর নিরাপত্তার জন্য 'ডগ স্কোয়াড' ইউনিট রাখার নির্দেশ দেন। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী বেশকিছু নির্দেশনাও দেন। নির্দেশনাগুলো হলো– সারা দেশের হাইওয়েগুলোয় এমন একটি মাস্টারপ্ল্যান করতে হবে, যাতে চালক-যাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট দূরত্ব অন্তর সার্ভিস সেন্টার থাকবে। দারিদ্র্যসীমা থেকে কোন কোন জেলা বের হয়ে আসতে পারল তার একটা ডাটাবেজ তৈরির বিষয়ে নির্দেশ দেন। ব্যবহার উপযোগী প্রকল্পে সোলার বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া দেশের কসাইখানাগুলো মানসম্মত ও আধুনিক করার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রতিবেদন: সুলতানা বেগম

তথ্যমন্ত্রী: বিশেষ প্রতিবেদন

নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধের এখনই সময়

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেন, বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী ও শিশু। নারী ও কন্যাশিশুদের এখনো সামাজিকভাবে অবজ্ঞা করা হয়। নারীরাও পুরুষের পাশাপাশি সমান তালে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। দেশের উন্নয়নের স্বার্থে নারীদেরকে পুরুষের সহযোদ্ধা হিসেবে সব ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতে হবে। সব ধরনের প্রতিবন্ধকতা দূর করে নারীরা নিজেদের মেধা ও যোগ্যতা দিয়ে নিজেদের অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে। এখন নারীর প্রতি সবধরনের সহিংসতা বন্ধ করার সময় এসেছে। ৯ই জুন চট্টগ্রাম পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতে তথ্য মন্ত্রণালয়ের শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশ বেতার আয়োজিত বহিরাঙ্গন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন তিনি। বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক নারায়ণ চন্দ্র শীল এ অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। তথ্যমন্ত্রী বলেন, '৯৬ সালের আগে বাংলাদেশের কেউ চিন্তাই করেনি নারীরা তাদের কর্মক্ষেত্রে এতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারবে। এটা সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ নেতৃত্বের জন্য। আজ নারীরা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, নারীরা জেলা প্রশাসক, নারীরা পুলিশ সুপার, নারীরা পাইলট, নারীরা বিমান, নৌ ও সেনাবাহিনীসহ সব ক্ষেত্রে দক্ষতার সাথে নেতৃত্ব দিচ্ছে'। তথ্যমন্ত্রী আরো বলেন, বাংলাদেশ বেতার শ্রোতাদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও আচরণগত দিক পরিবর্তনের চেষ্টা করে যাচ্ছে। কিশোর-কিশোরীদের বেতার অনুষ্ঠানে সম্পৃক্তকরণের নিমিত্তে ওরিয়েন্টেশন এবং ট্রেনিং অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সারা দেশে শ্রোতাক্লাব গঠন করেছে সরকার।

শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনই দেশের পুনর্জন্মস্বরূপ

১৯৮১ সালের ১৭ই মে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে এ দেশের পুনর্জন্মস্বরূপ বলে উল্লেখ করেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যুগান্তকারী নেতৃত্বে বাংলাদেশের যে অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে, পাকিস্তান সেজন্য আফসোস করে আর ভারতের নেতৃবৃন্দ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাতিসংঘের মহাসচিব, বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান অর্থনীতিবিদ তাঁর প্রশংসা করে বলেন, বাংলাদেশ যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে এটি একটি উদাহরণ। বিশ্ব গণমাধ্যমে বাংলাদেশকে নিয়ে নিবন্ধ লেখা হয়। তথ্যমন্ত্রী বলেন, সমস্ত পৃথিবী প্রশংসা করছে। আজকে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। দেশের উন্নয়ন আজ ধাবমান গতিতে এগিয়ে চলেছে। দেশের স্বার্থে, দেশের উন্নয়ন অগ্রগতির স্বার্থে একসাথে কাজ করুন। ২৮শে মে ২০১৯ রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটের সেমিনার হলে হাসুমণি'র পাঠশালা আয়োজিত 'দেশরত্ন শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন, বাংলাদেশের পুনর্জাগরণ' গোলটেবিল আলোচনায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন। হাসুমণি'র পাঠশালার সভাপতি মারুফা আক্তার পপি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। এসময় তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান বিশেষ অতিথি হিসেবে সভায় উপস্থিত ছিলেন। আলোচক ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান এবং দৈনিক সমকালের সহযোগী সম্পাদক অজয় দাশগুপ্ত। সূচনা বক্তব্য দেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ডিপার্টমেন্টের অধ্যাপক জুনায়েদ হালিম। তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তন ছিল মুক্তিযুদ্ধের ও গণতন্ত্রের চেতনার প্রত্যাবর্তন। তাঁর এ প্রত্যাবর্তনই এ দেশকে গণতন্ত্র আর উন্নয়নের পথ দেখিয়েছে। এই পথে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলতে সকল ষড়যন্ত্র ও অন্যায়কে রুখে দিতে হবে।

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ২৮শে মে ২০১৯ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট-এর সেমিনার হলে 'ঐতিহাসিক ১৭ই মে দেশরত্ন শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত গোলটেবিল আলোচনায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন। এসময় তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান উপস্থিত ছিলেন–পিআইডি

প্রতিবেদন: শারমিন সুলতানা শান্তা

ওআইসি সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান

১লা জুন: সৌদি আরবের মক্কার সাফা প্যালেসে ইসলামি দেশগুলোর জোট ওআইসির চতুর্দশ সম্মেলনের ভাষণে রোহিঙ্গারা যাতে মিয়ানমারে অধিকার নিয়ে বসবাস করতে পারে, তা নিশ্চিত করতে ওআইসিভুক্ত দেশগুলোকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বিশ্ব দুগ্ধ দিবস

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও যথাযথভাবে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর পালন করে 'বিশ্ব দুগ্ধ দিবস'

পবিত্র শবে কদর পালিত

যথাযোগ্য ধর্মীয় মর্যাদায় সারা দেশে পালিত হয় 'পবিত্র শবে কদর'

ঈদুল ফিতর উদ্‌যাপিত

৫ই জুন: উৎসাহ আনন্দের মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হয় 'পবিত্র ঈদুল ফিতর'

বিশ্ব অ্যাক্রিডিটেশন দিবস পালিত

৯ই জুন: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব অ্যাক্রিডিটেশন দিবস'

আন্তর্জাতিক আর্কাইভস দিবস পালিত

অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'আন্তর্জাতিক আর্কাইভস দিবস'

বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস

১২ই জুন: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস'। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– 'শিশুশ্রম নয়, শিশুর জীবন হোক স্বপ্নময়'

জাতীয় সংসদে (২০১৯-২০২০) বাজেট পেশ

১৩ই জুন: সমৃদ্ধ আগামীর পথযাত্রায় বাংলাদেশ: সময় এখন আমাদের, সময় এখন বাংলাদেশের– শিরোনামে জাতীয় সংসদে (২০১৯-২০২০) ৫ লাখ ২৩ হাজার ১৯০ কোটি টাকার বাজেট পেশ করেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল

বাজেটোত্তর সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী

১৪ই জুন: শেরেবাংলা নগরে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে চলতি অর্থবছরের বাজেট পেশ পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, প্রস্তাবিত বাজেট ভালো কল্যাণমুখী। এই বাজেট বাস্তবায়ন হলে দেশ আরো সমৃদ্ধ হবে। সবাই উপকৃত হবেন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১লা জুন ২০১৯ মক্কায় ১৪তম ওআইসি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন–পিআইডি

এসএসএফের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

১৫ই জুন: তেজগাঁওয়ে এসএসএফ অফিসার্স মেসে বাহিনীর ৩৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (এসএসএফ) সদস্যদের আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন হয়ে গড়ে ওঠার আহ্বান জানান

জাতীয় ফল প্রদর্শনী

১৬ই জুন ফার্মগেটে খামারবাড়িতে জাতীয় ফল প্রদর্শনী ও ফলদ বৃক্ষরোপণ পক্ষ ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দেশব্যাপী ১৬-৩০শে জুন 'ফলদ বৃক্ষরোপণ পক্ষ' ও ১৬-১৮ জুন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০শে জুন ২০১৯ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা এবং জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন–পিআইডি

জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোর স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূতদের সম্মানে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে ১১ই জুন ২০১৯ ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে কূটনীতিকদের সাথে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম-এর শুভেচ্ছা বিনিময়

জাতীয় ফল প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। ফলদ বৃক্ষরোপণ পক্ষের এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– 'পরিকল্পিত ফল চাষ যোগাবে পুষ্টি সম্মত খাবার'

সম্পূরক বাজেট পাস

১৭ই জুন: অতিরিক্ত ব্যয়ের অনুমোদন দিয়ে চলতি (২০১৮-২০১৯) অর্থবছরের সম্পূরক বাজেট জাতীয় সংসদে পাস হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্পূরক বাজেট উপস্থাপন করলে বিলটি কণ্ঠভোটে পাস হয়

মন্ত্রিসভার বৈঠক

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে 'বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন (সংশোধন) আইন ২০১৯'-এর খসড়া অনুমোদন লাভ করে

একনেক বৈঠক

১৮ই জুন: এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) বৈঠকে ১১ প্রকল্প অনুমোদিত হয়

বিশ্ব পরিবেশ দিবস

২০শে জুন: র‌্যালি ও আলোচনাসভার মধ্য দিয়ে সারা দেশে পালিত হয় 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস'। পরিবেশ দূষণ রোধে জনসচেতনতা বাড়াতে প্রতিবছর ৫ই জুন 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' পালিত হয়। কিন্তু এবছর ৫ই জুন বাংলাদেশে ঈদ উদ্‌যাপিত হওয়ায় ২০শে জুন দিবসটি পালিত হয়। এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'Air Pollution' বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা-২০১৯ এবং জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বিশ্ব শরণার্থী দিবস পালিত

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব শরণার্থী দিবস'। দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'শরণার্থীদের সঙ্গে পথ চলা'

বিশ্ব সংগীত দিবস উদ্‌যাপিত

২১শে জুন: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বর্ণাঢ্য আয়োজনে উদ্‌যাপিত হয় 'বিশ্ব সংগীত দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'সুরের আগুন ছড়িয়ে দেব সব প্রাণে'

বিশ্ব হাইড্রোগ্রাফি দিবস পালিত

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিশ্ব হাইড্রোগ্রাফি দিবস পালিত হয়। এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'হাইড্রোগ্রাফিক ইনফরমেশন ড্রাইভিং নলেজ'

বিশ্ব যোগ দিবস পালিত

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ভারতের হাইকমিশনের উদ্যোগে নানা আয়োজনে উদ্‌যাপিত হয় 'বিশ্ব যোগ দিবস'। দিবসটির প্রতিপাদ্য– 'শান্তি, সম্প্রীতি ও সমৃদ্ধির জন্য ইয়োগা'

২ কোটি ২০ লাখ শিশু খেল ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল

২২শে জুন: জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইনের আওতায় সারা দেশে ছয় মাস থেকে পাঁচ বছর বয়সি ২ কোটি ২০ লাখ শিশুকে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়। ঢাকা শিশু হাসপাতালে ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইনের উদ্‌বোধন করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক।

প্রতিবেদন: আখতার শাহীমা হক

আন্তর্জাতিক : বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাদেশ জাতিসংঘের ইকোসকের সদস্য নির্বাচিত

জাতিসংঘের মর্যাদাপূর্ণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের (ইকোসক) সদস্যপদের নির্বাচনে বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়েছে বাংলাদেশ। এর ফলে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চল থেকে বাংলাদেশ ৫৪ সদস্যবিশিষ্ট এই পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হলো। সংস্থাটির ২০২০-২২ মেয়াদের এই নির্বাচনে ১৯১ ভোটের মধ্যে বাংলাদেশ ১৮১ ভোট পেয়েছে। ১৫ই জুন জাতিসংঘের বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জাতিসংঘ সদর দপ্তরে ১৪ই জুন অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে বাংলাদেশ ছাড়াও এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চল থেকে থাইল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া ও চীন বিজয়ী হয়েছে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি মারিয়া ফার্নেন্দা এস্পিনোসা গার্সেজের সভাপতিত্বে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গোপন ভোটে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

এই বিজয় অর্জনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ২০২০-২২ মেয়াদে বহুপক্ষীয় কূটনৈতিক প্ল্যাটফর্মে এবং বৈশ্বিক আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফোরাম ইকোসকে তার দৃঢ় অবস্থান নিশ্চিত করল। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ রূপকল্প ২০২১ ও এজেন্ডা ২০৩০ অর্জনে অদম্য গতিতে এগিয়ে চলেছে এবং বিশ্বের বুকে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। বিপুল ভোটে এই বিজয় তারই বৈশ্বিক স্বীকৃতি বলে মন্তব্য করেন উপস্থিত বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকরা।

বিদেশি কূটনীতিকদের সম্মানে ঈদ পুনর্মিলনী

জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোর স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূতদের সম্মানে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে ১১ই জুন এক ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম এমপি ও পররাষ্ট্র সচিব মো. শহীদুল হক। অনুষ্ঠানটি ভারত, শ্রীলঙ্কা, জাপান, রাশিয়া, চীন, সৌদি আরব, কাতারসহ শতাধিক দেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও বিভিন্ন পর্যায়ের কূটনীতিকদের মিলনমেলায় পরিণত হয়। বিশাল এ সমাগমে ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশনের (আইওএম) ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল পদে আসন্ন নির্বাচনে বাংলাদেশের প্রার্থী হিসেবে পররাষ্ট্র সচিব মো. শহীদুল হকের প্রার্থিতার বিষয়টি ছিল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।

বাংলাদেশের প্রার্থীকে সমর্থনের আহ্বান জানিয়ে উপস্থিত কূটনীতিকদের উদ্দেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন। বাংলাদেশের যুগান্তকারী উন্নয়ন অগ্রযাত্রার বিভিন্ন দিকও বিদেশি অতিথিদের সামনে তুলে ধরেন স্থায়ী প্রতিনিধি। পাশাপাশি রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধানে সদস্য দেশগুলোকে কার্যকর ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান তিনি।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন

জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ঘূর্ণিঝড়ের আগাম তথ্য জানার নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। জাপান ও বাংলাদেশের যৌথ তত্ত্বাবধানে দেশে প্রথমবারের মতো এ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) এক দল গবেষক। সাইক্লোন ক্লাসিপায়ার মডেল (সিসিএম) নামের ওই পদ্ধতির মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড়ের সময় উপকূলীয় ১৯ জেলার ১৫৩ উপজেলায় বাতাসের গতিবেগ জানা যাবে। বের করা যাবে জোয়ার ও ভাটার সময় জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে উপকূলীয় জেলায় বেড়িবাঁধগুলোর কোনটি ভাঙার পরিস্থিতি তৈরি হবে আর কোনটি ভাঙবে না, সেটিও জানা যাবে আগেভাগে। এছাড়া উপকূলীয় এলাকায় কাঁচা, আধাপাকা, পাকা এই তিন শ্রেণির কোন শ্রেণির বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হবে, সেটি আগাম জানা যাবে সিসিএম পদ্ধতি ব্যবহার করে। ঘূর্ণিঝড় উপকূলে আঘাত হানার সময় জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা কত হবে, সিসিএম ব্যবহার করে সেটিও দেখা যাবে। এই পদ্ধতি দেশের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ১৭০টি ঘূর্ণিঝড়ের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে উদ্ভাবন করা হয়েছে। বুয়েটের গবেষক দলের মতে, ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানার আগেই সম্ভাব্য আক্রান্ত স্থানের তথ্য জানা থাকলে একদিকে যেমন নিরাপদ আশ্রয়ে মানুষকে সরানো সম্ভব হবে, অন্যদিকে মানুষের মধ্যেও সচেতনতা বাড়বে। একইভাবে এই তথ্য উপকূলীয় বাঁধ পুনঃনির্মাণ, উপকূলীয় এলাকার জন্য উপযুক্ত আবাসস্থল তৈরিতেও দিক নির্দেশক হিসেবে কাজ করবে।

দেয়াল লিখন বা পেরেক মারলে অর্থদণ্ড

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) মেয়র মো. আতিকুল ইসলাম ১৮ই জুন ২০১৯ এক সম্মেলনে দেয়াল লিখন বা গাছে পেরেক মারলে বিজ্ঞাপনদাতাদের অর্থদণ্ড দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে শিশুদের স্বপ্নের শহর শীর্ষক সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন। ঢাকা শহরে প্রায়ই গাছের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সাইনবোর্ড দেখা যায়। পেরেক দিয়ে এসব গাছে লাগানো হয়, যা গাছগুলো নষ্ট করে শহরের সৌন্দর্য হানিকর। এ ধরনের বিজ্ঞাপন দিয়ে যারা ঢাকা শহরকে নষ্ট করে তাদেরকে জরিমানা করা হবে। প্রয়োজনে সর্বোচ্চ শাস্তি দেওয়ার নির্দেশ দেন মেয়র।

এশিয়া-প্যাসিফিকে প্রবৃদ্ধিতে শীর্ষ

বাংলাদেশের উচ্চ প্রবৃদ্ধির তথ্য তুলে ধরে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের ৪৫টি দেশের মধ্যে শীর্ষে বাংলাদেশ। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট আউটলুক (এডিও) ২০১৯-এ বলা হয়েছে, '১৯৭৪ সালের পর বাংলাদেশের অর্থনীতির দ্রুততম প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২০১৮ সালে ৭.৯০ শতাংশ যা এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের ৪৫টি অর্থনীতির মধ্যে দ্রুততম'। দক্ষ নেতৃত্ব, সুশাসন, স্থিতিশীল সরকার, শান্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বলিষ্ঠ সামষ্টিক ও অর্থনৈতিক নীতিমালা এবং সঠিকভাবে উন্নয়নে অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণে বাংলাদেশের এ প্রবৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকের উপস্থিতিতে ১৭ই জুন ২০১৯ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক অথরিটি ও জাপানের ফুজিৎসু রিসার্চ ইনস্টিটিউটের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়–পিআইডি

ডিজিটাল বাংলাদেশ

হাইটেক পার্কের সঙ্গে কাজ করবে জাপানের ফুজিৎসু

বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কাজ করবে জাপানের ফুজিৎসু। মানবসম্পদ উন্নয়ন ও বিনিয়োগ আকর্ষণে এক সঙ্গে কাজ করবে এই দু'পক্ষ। এলক্ষ্যে হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে ফুজিৎসু রিসার্চ ইনস্টিটিউট (এফআরআই)। ১৭ই জুন ২০১৯ রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আনুষ্ঠানিকভাবে দু'পক্ষের মধ্যে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এতে হাইটেক পার্কের পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক হোসনে আরা বেগম এবং ফুজিৎসু রিসার্চ ইন্সটিটিউটের পক্ষে প্রেসিডেন্ট এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত আবাসিক প্রতিনিধি শিনজো কাগাওয়া স্বাক্ষর করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক।

অনুষ্ঠানে জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া প্রথম দেশগুলোর মধ্যে জাপান অন্যতম। আর তখন থেকেই জাপান বাংলাদেশের পরম বন্ধু হিসেবে রয়েছে। বাংলাদেশের উন্নয়নে জাপান সবসময়ই সাহায্য সহযোগিতা দিয়ে আসছে। ২০২৪ সাল নাগাদ আইসিটি খাতে বাংলাদেশের রফতানির লক্ষ্যমাত্রা ৫ হাজার বিলিয়ন ডলার। এলক্ষ্য অর্জনে জাপান বাংলাদেশের সেরা বন্ধু হিসেবে থাকবে বলে আমরা আশা করি। আইটি ও আইসিটি খাতে বাংলাদেশে দক্ষ জনবল তৈরি এবং বাংলাদেশে জাপানি বিনিয়োগ আনতে ফুজিৎসু রিসার্চ ইনস্টিটিউট কাজ করবে জানিয়ে প্রেসিডেন্ট শিনজো কাগাওয়া বলেন, এ খাতে বাংলাদেশের উন্নতি দেখে জাপান আগ্রহী হয়ে উঠছে। দুই দেশের আইটি প্রতিষ্ঠানগুলো একে অপরের সঙ্গে কাজ করে আরো এগিয়ে যাবে এমন লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি। জাপানি প্রতিষ্ঠানগুলো যেন বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী হয়, প্রয়োজনীয় তথ্য পায় সেজন্য জাপানের আইটি হাব হিসেবে আমরা কাজ করবো। এছাড়াও এখনকার জনবলকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে প্রশিক্ষণ দেব।

জাতীয় সংসদকে বিশ্বের আধুনিকতম ডিজিটাল সংসদ হিসেবে গড়ে তোলা হবে

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদকে বিশ্বের আধুনিকতম ডিজিটাল সংসদ হিসেবে গড়ে তোলা হবে। ৩০শে মে সংসদ ভবনের শপথ কক্ষে সংসদ সচিবালয়, এটুআই প্রোগ্রাম ও আইসিটি ডিভিশন কর্তৃক আয়োজিত ৬ দিনের 'ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ও পরিকল্পনা ল্যাব' শীর্ষক কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদকে বিশ্বের আধুনিকতম ডিজিটাল সংসদ হিসেবে গড়ে তোলা হবে। এ সংসদ হবে বিশ্বে ডিজিটাল সংসদের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। আর এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহযোগিতা করবে সরকার। পলক আরো বলেন, '২০০৯ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদৃষ্টি সম্পন্ন সিদ্ধান্ত নতুন চিন্তার দ্বার উন্মোচন করে। তিনি প্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন স্বপ্ন নয় বাস্তবতা। এসময় ২০২১ সালের মধ্যেই সংসদ সদস্যগণ যে-কোনো স্থান থেকে ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করে সংসদ কার্যক্রমে অংশ নিতে সক্ষম হবেন বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

শিল্প-বাণিজ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

দ্রুত খুলছে জাপানের দুয়ার

চীন, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও ফিলিপাইন আজকে যে অবস্থানে পৌঁছেছে তার পেছনে একটা বড়ো অবদান জাপানিদের। জাপানি কোম্পানিগুলো ওই সব দেশে কারখানা ও প্রযুক্তি হস্তান্তর করেছে তাতে স্থানীয় শিল্পের সক্ষমতা তৈরি হয়েছে। ফলে মানুষের জীবনমানের উন্নতি হয়েছে।

বাংলাদেশে এখন জাপানি কোম্পানিগুলোর বিনিয়োগ বাড়ছে। পাশাপাশি জাপান সরকারও বাংলাদেশে তাদের উন্নয়ন সহায়তা বাড়িয়েছে। একইসঙ্গে জাপানের বাজারে বাংলাদেশের পণ্যের রপ্তানি বাড়ছে। এতে করে জাপান বাংলাদেশের বড়ো বাণিজ্য ও বিনিয়োগ অংশীদার হয়ে উঠছে।

জাপান ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অর্গানাইজেশনের (জেট্রো) তথ্য অনুযায়ী ২০০৮ সালে বাংলাদেশে জাপানি কোম্পানির সংখ্যা ছিল ৭০টি। এক দশক পর ২০১৮ সালে সংখ্যাটি ২৭৮-এ উন্নীত হয়েছে। বিশ্বের তৃতীয় শীর্ষ ইস্পাত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে-এর নেতৃত্বে ২৯শে মে ২০১৯ জাপানের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে দু'দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়-পিআইডি

নিপ্পন স্টিল অ্যান্ড সুমিতমো মেটাল দেশীয় প্রতিষ্ঠান ম্যাকডোনাল্ড স্টিল বিল্ডিং প্রোডাক্টসের সঙ্গে যৌথ বিনিয়োগে মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে ইস্পাত কারখানা করছে। তারা ১০০ একর জমি বরাদ্দের বিষয়ে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা) সঙ্গে চুক্তি করেছে।

জাপানের সজিত করপোরেশন মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে শিল্প পার্ক করতে চাইছে। জাপানের সুমিতমো করপোরেশন জাপান অর্থনৈতিক অঞ্চলের উন্নয়ন কাজ করতে ২৬শে মে চুক্তি করেছে বেজার সঙ্গে। ঢাকায় একের পর এক স্টোর খুলছে জাপানি পোশাকের ব্র্যান্ড ইউনিক্লো ও লাইফস্টাইল ব্র্যান্ড মিনিসো।

জাপানের অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিনিয়োগ প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৮ সালে জাপানি কোম্পানিগুলো বাংলাদেশে ১ হাজার ৫৭০ কোটি ইয়েন বিনিয়োগ করেছে। প্রতি ইয়েনের বিনিময় মূল ৭৭ পয়সা ধরে বাংলাদেশি মুদ্রায় যার পরিমাণ ১ হাজার ২১২ কোটি টাকা। আগের বছরের চেয়ে এদেশে জাপানের বিনিয়োগ বেড়েছে ৩৯ শতাংশ বেশি।

জাপানের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য বাড়ছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম ১০ মাস, অর্থাৎ জুলাই-এপ্রিল সময়ে জাপানে ১১৭ কোটি ডলারের বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানি হয়। যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ২৩ শতাংশ বেশি। একইসঙ্গে জাপান থেকে বাংলাদেশের পণ্য আমদানিও বাড়ছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দেশে ১৮৭ কোটি ডলারের জাপানি পণ্য আমদানি হয়েছে, এক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি প্রায় ৪ শতাংশ।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

৪৩১২টি ইবতেদায়ি মাদ্রাসা এমপিওভুক্তির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত

সারা দেশে নিবন্ধিত ৪ হাজার ৩১২টি ইবতেদায়ি মাদ্রাসাকে এমপিও ভুক্তির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রতি প্রতিষ্ঠানে ৫ জন করে মোট ২১ হাজার ৫৬০ জন শিক্ষককে এমপিও দেওয়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে। এসব শিক্ষকের এমপিও দিতে ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট থেকে বার্ষিক ৩১০ কোটি ৯৭ লাখ ৭১ হাজার ২৮০ টাকার অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ৮ই মে শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এ সংক্রান্ত প্রস্তাব পাঠায়। ১২ই জুন প্রধানমন্ত্রী এ সংক্রান্ত নথি অনুমোদন করেন। এসব প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হলে শিক্ষকরা মাসিক জাতীয় বেতন স্কেলের বিভিন্ন গ্রেডে বেতন পাবেন। সেই অনুযায়ী মাদ্রাসার প্রধানরা পাবেন ১১ কোডে ১২ হাজার ৫০০ টাকা করে। ১ হাজার ৫০০ টাকা পাবেন বাড়ি ভাড়া ও চিকিৎসা ভাতা, ২ হাজার ৫০০ টাকা পাবেন বৈশাখি ভাতা এবং ৬ হাজার ২৫০ টাকা করে বছরে ২টি উৎসব ভাতা। আর একজন জুনিয়র শিক্ষক, ২ জন জুনিয়র মৌলবি এবং একজন ক্বারী পাবেন ১৬ কোডে ৯ হাজার ৩০০ টাকা করে। মাসে দেড় হাজার টাকা করে পাবেন বাড়িভাড়া ও চিকিৎসা বাবদ, ১ হাজার ৮৬০ টাকা পাবেন বৈশাখি ভাতা এবং ৪ হাজার ৬৫০ টাকা করে বছরে ২টি উৎসব ভাতা পাবেন।

পাবলিক পরীক্ষার সময় কমছে

জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি), মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) ও উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) সহ সমমানের সব পাবলিক পরীক্ষা সম্পন্নের সময় কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। জেএসসি পরীক্ষার সময় ১৫ দিন থেকে ১০ দিনে, এসএসসি ২৮-৩০ দিন থেকে ২০ দিনে এবং এইচএসসি ৪৫ দিন থেকে ৩০ দিনে সম্পন্নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী বছর থেকে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা যায়। পাবলিক পরীক্ষার সময় বিভিন্ন কেন্দ্রের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠদান বন্ধ থাকে। নতুন সিদ্ধান্তে সাধারণ শিক্ষার্থীরা নিয়মিত ক্লাস করতে পারবে, অভিভাবকদের মানসিক চাপ দূর হবে এবং পরীক্ষা শেষে প্রশ্ন ফাঁসের ঝুঁকি এড়ানো যাবে। এসব কারণে দ্রুত পরীক্ষা সম্পন্নের নতুন এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

প্রতিবেদন: মো. সেলিম

বিনিয়োগ: বিশেষ প্রতিবেদন

বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে রেকর্ড অগ্রগতি বাংলাদেশের

২০১৮ সালে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) আকর্ষণের দিক দিয়ে রেকর্ড পর্যায়ের অগ্রগতি করেছে বাংলাদেশ। গত বছর বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগের প্রবাহ ৬৮ শতাংশ বেড়ে ৩৬০ কোটি ডলারে পৌঁছেছে। বিদ্যুৎ ও পোশাক শিল্প খাতে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ আকর্ষণের মধ্য দিয়ে এ অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হয়। ১২ই জুন ২০১৯ জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংস্থা (আঙ্কটাড) প্রকাশিত বিশ্ব বিনিয়োগ প্রতিবেদন ২০১৯-এ বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগের এ চিত্র উঠে এসেছে। আশা করা হচ্ছে এ অগ্রগতির ধারা অব্যাহত থাকবে।

আঙ্কটাডের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দক্ষিণ এশিয়ায় ২০১৮ সালে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ হয়েছে ৫ হাজার ৪০০ কোটি ডলার, যা আগের বছরের তুলনায় ৪ শতাংশ বেশি। গড়ে সাড়ে তিন শতাংশ বিনিয়োগ বেড়েছে। তবে বাংলাদেশে বিনিয়োগ বেড়েছে সবচেয়ে বেশি (৬৮ শতাংশ)। প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও পোশাক কারখানাসহ শ্রমভিত্তিক শিল্পগুলোতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিনিয়োগ হওয়ার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ এসডিআই-এর ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

অর্থনীতিবিদ ও নীতিনির্ধারকরা বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রশংসা করেছেন। বিশ্ব ব্যাংকের ইজি অব ডুয়িং বিজনেস-২০১৯ বা সহজে ব্যবসা করার সূচক ২০১৯-এ ১৯০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৭৬তম। এ সূচকটি বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করা হয়। বাংলাদেশ সরকার ২০২১ সালের মধ্যে এ সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান দুই অঙ্কে অর্থাৎ কমপক্ষে ৯৯তম অবস্থানে নিয়ে আসার লক্ষ্য ঠিক করেছে। এজন্য সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার জন্য কর্মপরিকল্পনা ঠিক করেছে বিডা।

উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও দক্ষতা উন্নয়নে বিডার কর্মশালা

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)-এর আয়োজনে 'তারুণ্যের শক্তি-বাংলাদেশের সমৃদ্ধি'- এই প্রতিপাদ্যকে তুলে ধরে ২০২০ সালের মধ্যে প্রান্তিক মাঠ পর্যায়ে ২৪ হাজার উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প-এর প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্‌বোধন করা হয়েছে। বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান কাজী মো. আমিনুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে প্রকল্প কার্যালয়ে ৩০শে মে ২০১৯ কর্মশালার উদ্‌বোধন করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে কাজী মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, এ প্রকল্পের তরুণ প্রশিক্ষকদের মূল কাজ হচ্ছে ভবিষ্যৎ নির্মাণ। অতীতে শ্রমনির্ভর কর্মকাণ্ডের ওপর উন্নয়ন নির্ভর করত। কিন্তু এখন প্রযুক্তি ও জ্ঞান নির্ভর সমাজ। আমাদের আরো অনেক দূর যেতে হবে। তাই এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে ভবিষ্যৎ নির্মাণের। উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ দরকার। চাকরি খোঁজা নয়, চাকরিদাতায় রূপান্তরিত হতে হবে। এসময় অনুষ্ঠানে প্রকল্প পরিচালক, বিডা'র নির্বাহী সদস্যসহ কর্মকর্তাগণ এবং ৬৪ জন প্রশিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদন: এস আর সবিতা

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

বাজেট ২০১৯-২০ নারীর জন্য বাড়ল কয়েকটি সুবিধা

নারীদের কাজের সুবিধার জন্য এখন রাজধানী ও বড়ো শহরে গড়ে উঠেছে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র বা চাইল্ড ডে-কেয়ার সেন্টার। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারীরাই এসব শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের উদ্যোক্তা। শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের এমন সেবার ওপর ভ্যাট দিতে হবে না। কোনো নারী উদ্যোক্তা যদি এমন শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র তৈরি করেন তাহলে এই সেবার ওপর কর সুবিধা পাবেন।

অনেক নারী ছোটোখাটো প্রতিষ্ঠান করে বিভিন্ন ধরনের নকশা বা ডিজাইনের কাজ করেন। সেসব ক্ষেত্রেও ভ্যাট থাকছে না। কোনো ব্যবসায়ী যদি কোনো ব্যবসায় নারী কর্মী দিয়ে শোরুম বা বিক্রয়কেন্দ্র পরিচালনা করেন তবে ঐ বিক্রয়কেন্দ্রের ভাড়ার ওপর কোনো ভ্যাট দিতে হবে না।

নারীর কাজে সহায়ক হয় এমন কিছু পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ২০২৪ সাল পর্যন্ত কর অবকাশ সুবিধা দেওয়া হয়েছে। যেমন: রাইস কুকার, ব্লেন্ডার, ওয়াশিং মেশিন ইত্যাদি। রপ্তানিমুখী হস্তশিল্প মূলত নারীরাই কাজ করে বলে হস্তশিল্পের কর অবকাশ সুবিধা মেয়াদও পাঁচ বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে।

দেশের তরুণ-তরুণীদের জন্য স্টার্ট আপ ফান্ড বা ব্যবসা শুরুর জন্য এবারের বাজেটে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। নারী করদাতাদের করমুক্ত আয় সীমা আগের মতোই তিন লাখ টাকা রাখা হয়েছে।

কাজের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ ভেদাভেদ করার সুযোগ নেই

কর্মক্ষেত্রে নারী আর পুরুষে ভেদাভেদ করার কোনো সুযোগ নেই। দেশ পরিচালনার মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এখন নারীর হাতে। নারীর এই অগ্রযাত্রাকে কেউ রুখে দিতে পারবে না। রাজধানীর ধানমণ্ডির বিসিএস ইনোভেশন সেন্টারে ২৫শে মে 'প্রযুক্তির কর্মক্ষেত্রে নারী' শীর্ষক মুক্ত সংলাপ এবং প্রকল্প উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী ইয়াফেস ওসমান। এ প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে নারী স্নাতকদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করবে বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ক।

ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর নারীর প্রথম পিএইচডি লাভ

বাংলাদেশে যে ৫০টির বেশি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী রয়েছে তাদের মধ্যে রুপানন্দা প্রথম পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। চাকমা জাতিগোষ্ঠীর রুপানন্দা ২০১৭ সালে অস্ট্রেলিয়ার ইউনিভার্সিটি অব অ্যাডিলেড থেকে পিএইচডি ডিগ্রি নেন।

সাহিত্য পুরস্কার পেলেন দিলারা হাশেম

বাংলা সাহিত্যে অসামান্য অবদানের জন্য মুক্তধারা-জিএফবি সাহিত্য পুরস্কার পেলেন কথা সাহিত্যিক দিলারা হাশেম। ১৫ই জুন ২৮তম নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলায় তাঁর হাতে এ পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। জ্যাকসন হাইটসে বইমেলার নির্ধারিত মঞ্চে তাঁর গলায় উত্তরীয় পরিয়ে দেন কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন।

চার দশকের বেশি সময় ধরে যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছেন দিলারা হাশেম। কাজ করছেন ভয়েস অব আমেরিকার বাংলা বিভাগে। উল্লেখ্য, ১৪ই জুন থেকে নিউইয়র্কে শুরু হয় চারদিনব্যাপী বাংলা বইমেলা।

চাঁদে যাবেন প্রথম নারী নভোচারী

২০২৪ সালে চাঁদে আবার মানুষ পাঠানো হবে আর এই অভিযানে প্রথমবারের মতো চাঁদের মাটিতে পা রাখতে যাচ্ছেন একজন নারী নভোচারী। নাসা এবার চাঁদের দক্ষিণ মেরুকে লক্ষ্যবস্তু করেছে। এটি চাঁদের স্থায়ী অন্ধকারাচ্ছন্ন চ্যালেঞ্জিং একটি অংশ। আর ঐ নারী নভোচারী যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (নাসা) সূত্রে এ কথা জানা গেছে।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

১০৯ সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

চট্টগ্রামের চার হাজার ৪৪৮টি পরিবারকে পুনর্বাসন

চট্টগ্রাম জেলার পাঁচটি উপজেলায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২৭৬টি পরিবারকে পুনর্বাসিত করা হয়েছে। আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে এ পর্যন্ত চট্টগ্রাম জেলায় ১৪টি উপজেলায় চার হাজার ৪৪৮টি পরিবারকে পুনর্বাসিত করা হয়েছে। ১২ই জুন চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজ, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প, বাস্তবায়নকল্পে মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে আয়োজিত কর্মশালায় জেলা প্রশাসন এ তথ্য জানায়।

কর্মশালায় প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের প্রকল্প পরিচালক (আশ্রয়ণ-২) মো. মাহবুব হোসেন বলেন, বাংলাদেশ দুর্যোগপ্রবণ দেশ হলেও বন্যাদুর্গত মানুষদের জন্য সরকারের আন্তরিকতার অভাব নেই। গৃহহীন মানুষের কষ্টের বিষয়টি অনুধাবন করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে ১৯৯৭ সাল থেকে আশ্রয়ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়ে আসছে। তিনি আরো বলেন, সরকার গৃহহীন মানুষদের জন্য সংবিধানিক দায়িত্ব পালন করছে। 'একটি মানুষও গৃহহীন থাকবে না'– প্রধানমন্ত্রীর এ অঙ্গীকারের আলোকে দেশের সব গৃহহীন মানুষকে বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে।

প্রকল্প পরিচালক আরো জানান, শহর বা পাহাড়ি এলাকায় খাসজমির স্বল্পতার কারণে এসব এলাকায় ৫ তলা দালান নির্মাণ করা হবে। এজন্য ৫০টি দালান নির্মাণের অনুমতি পাওয়া গেছে। এছাড়া জরাজীর্ণ ঘরগুলো অচিরেই সংস্কার করা হবে। উল্লেখ্য কর্মশালায় চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণও উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদন: মেজবাউল হক

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

কৃষি মন্ত্রণালয় গুরুত্ব দিচ্ছে উচ্চমূল্যের ফসল

লাভজনক কৃষির কথা মাথায় রেখে উচ্চমূল্যের ফসল আবাদের প্রতি গুরুত দিচ্ছে কৃষি মন্ত্রণালয়। উচ্চমূল্যের কাজু বাদাম পুষ্টিকর এবং মজাদার খাদ্য। এটি উৎকৃষ্ট শিশুখাদ্যও বটে, যার চাহিদা সারা বিশ্বে দিন দিন বাড়ছে। এর এক একটি গাছ ৫০ কেজি করে গ্রিন হাউস গ্যাস (কার্বন ডাই-অক্সাইড) শোষণ করে। এ গাছটিকে পরিবেশের বন্ধুও বলা চলে। বাদাম উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণে জনবলের প্রয়োজন হয়। বিশেষ করে নারীদের কর্মসংস্থান হবে। ১২ই জুন কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক তাঁর মন্ত্রণালয়ের অফিসকক্ষে কাজু বাদাম উৎপাদনকারী, প্রক্রিয়াজাতকারী ও রপ্তানিকারক অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠকে এসব কথা বলেন। এতে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের সভাপতি মোঃ হারুন।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, সরকার সব সময় কৃষকের লাভের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রেও সরকারের সর্বাত্মক সহযোগিতা থাকবে। কাজু বাদাম আবাদ মোটামুটি সহজ। এটি চাষের ক্ষেত্র প্রসারিত করার পরামর্শ দেন তিনি।

ভিয়েতনাম থেকে উচ্চফলনশীল জাতের চারা আমদানির ব্যাপারে মন্ত্রী বলেন, প্রয়োজনে কাজু বাদাম চারায় সরকার আর্থিক সহায়তা

প্রদান করবে। আরো অধিক সংখ্যক খামারিকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, সকল উপযোগী পতিত জায়গায় এর চাষ করার তাগিদ দেন। প্রক্রিয়াজাতসহ অন্যান্য সমস্যা সমাধানে সরকার সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে বলে জানান। প্রয়োজনে খামারিদের বিদেশে অভিজ্ঞতা অর্জন ও প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করা হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কাজু বাদামের সবচেয়ে বড়ো আমদানিকারক এবং ক্রেতা।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ২০১৪ সাল থেকে বান্দরবানের রুমা উপজেলার পাশাপাশি থানচি, রোয়াংছড়ি ও সদর উপজেলা, খাগড়াছড়ি এবং রাঙ্গামাটিতে কাজু বাদাম চাষ হচ্ছে। বর্তমানে প্রায় ২ হাজার হেক্টর জমিতে চাষ হচ্ছে। নিজস্ব চারা থেকে উৎপাদিত গাছ উৎপন্ন বাদামে তারা লাভবান হচ্ছে। তাদের ২০২১ সালের লক্ষ্যমাত্রা ৮০ হাজার মেট্রিক টন। ২০৩০ সালের মধ্যে ১৫ কোটি গাছ রোপণ করে ২ লাখ হেক্টর জমি চাষের আওতায় আনা হবে। এতে উৎপাদন হবে প্রায় ১০ লাখ মেট্রিক টন, যার বাজার মূল্য ২৬ হাজার কোটি টাকা। আমাদের প্রসেসিং কারখানা থাকলে এবং প্রসেসিং করে রপ্তানি করা গেলে এই অর্থের পরিমাণ দ্বিগুণ হবে।

কৃষকের কাছ থেকে আরো ধান কিনবে সরকার

চলমান বোরো মৌসুমে সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে আরো ২ লাখ ৫০ হাজার মেট্রিক টন ধান কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। ২৬ টাকা দরে ধান সংগ্রহ করা হবে। ১১ই জুন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এ সিদ্ধান্তের কথা জানান খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার। খাদ্যমন্ত্রী বলেন, এ বছর ধানের উৎপাদন অনেক বেশি হয়েছে। ফলে ধানের মূল্য একটু কমেছে। কৃষকের এ ক্ষতি পুষিয়ে নেবার জন্য আরো ২ লাখ ৫০ হাজার মেট্রিক টন ধান ক্রয় করা হবে। সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ধান ক্রয় করে সেই ধান মিলারদের নিকট দেওয়া হবে চালে রূপান্তর করার জন্য। পাশাপাশি এ সমস্যা সমাধানে স্থায়ী পথ খোঁজা হচ্ছে। সারা দেশে ২০০টি জায়গায় ১০ লাখ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন প্যাডি সাইলো নির্মাণ করা হবে। প্রতিটির ধারণক্ষমতা হবে ৫ হাজার মেট্রিক টন।

খাদ্যমন্ত্রী আরো বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। এক সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও নানা কারণে দেশে খাদ্য ঘাটতি দেখা দিত। এখন বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। উত্তরবঙ্গে এখন আর মঙ্গা নেই। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরামর্শ দিয়েছেন কীভাবে ধানের দাম বাড়ানো যায়। তিনি আমাদের আরো বেশি ধান কেনার এবং কৃষকদের কাছ থেকে ধান কিনে মিলারদের মাধ্যমে চাল করার পরামর্শ দিয়েছেন। কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি ধান কেনার ক্ষেত্রে আর্দ্রতা প্রধান সমস্যা। এ সমস্যা দূর করার জন্য ৩ হাজার আর্দ্রতা পরিমাপ করার মিটার কেনার অর্ডার দেয়া হয়েছে। এ সমস্ত মিটার ইউনিয়ন পর্যায়ে বিতরণ করা হবে যাতে কৃষকরা তাদের ধানের আর্দ্রতা নিজ গ্রামেই পরিমাপ করতে পারে। উল্লেখ্য, চলমান বোরো মৌসুমে ১০ লাখ মেট্রিক টন সেদ্ধ চাল, দেড় লাখ মেট্রিক টন আতপ চাল এবং দেড় লাখ মেট্রিক টন ধান (এক লাখ মেট্রিক টন চালের সমপরিমাণ) সংগ্রহ করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ৩৬ টাকা দরে সেদ্ধ চাল, ৩৫ টাকা দরে আতপ চাল এবং ২৬ টাকা দরে ধান সংগ্রহ করা হচ্ছে। গমের সংগ্রহ মূল্য ২৮ টাকা। ধান-চাল সংগ্রহ অভিযান ২৫শে এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে। চলবে ৩১শে আগস্ট পর্যন্ত। গম সংগ্রহ করা হবে ১লা এপ্রিল থেকে ৩০শে জুন পর্যন্ত। আবার নতুন করে আরো ২ লাখ ৫০ হাজার মেট্রিক টন ধান কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। খাদ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, খাদ্য সচিব শাহবুদ্দিন আহমদসহ মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

প্রতিবেদন: এনায়েত হোসেন

কর্মসংস্থান: বিশেষ প্রতিবেদন

২০৩০ সালের মধ্যে ৩ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান

১৩ই জুন ২০১৯ জাতীয় সংসদে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট পেশ করা হয়। অর্থমন্ত্রী লিখিত বাজেট বক্তৃতায় বলেন, একদিকে শ্রমবাজারে বিপুল কর্মক্ষম জনশক্তির আগমন, অন্যদিকে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে শ্রমিকের চাহিদা কমে যাওয়ার বিষয়টি সরকার অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছে এবং এর সমাধানে নানাবিধ পদক্ষেপ নিচ্ছে। সরকার শিল্প খাতে কর্মসৃজনের গতি বাড়ানোর লক্ষ্যে ব্যবসা ও বিনিয়োগ পরিবেশ আধুনিকায়ন, শ্রমিকের সুরক্ষা জোরদার করা এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অধিক হারে কর্মে প্রবেশ উপযোগী আইন-বিধি, নীতি-কৌশল সংস্কারের জন্য তিন বছর মেয়াদের কার্যক্রম শুরু করেছে।

চলতি অর্থবছরে ১০টি আইন-বিধি, নীতি-কৌশল প্রণয়ন অথবা সংস্কার শেষ হয়েছে। আগামী দুই বছরে অবশিষ্ট সংস্কার কাজ শেষ করে ক্রমবর্ধমান জনশক্তির জন্য মানসম্পন্ন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে। বিশেষ জনগোষ্ঠীর প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে তিন কোটি মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্বের অবসান ঘটানো হবে।

বাজেট বক্তৃতায় আরো বলা হয়, বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে সারা দেশে ১১১টি প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং উপজেলা পর্যায়ে ৪৯৮টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ হচ্ছে। অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করা

হবে। যুবকদের মধ্যে সকল প্রকার ব্যবসা উদ্যোগ সৃষ্টির জন্য ১০০ কোটি টাকা চলতি অর্থবছরে বাজেটে বরাদ্দ রাখা হবে।

বাংলাদেশের জন্য যুবকদেরকে দক্ষতা অর্জন করতে হবে

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার ১৫ই জুন ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবে বৃহত্তর ময়মনসিংহ যুব সমিতি, ঢাকা'র উদ্যোগে আয়োজিত বার্ষিক সাধারণ সভা ও ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বলেন, যুব সমাজ আমাদের ভবিষ্যৎ। তাদের আগামীর বাংলাদেশের উপযোগী দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। দেশের অভাবনীয় অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে প্রযুক্তিগত দক্ষতা জরুরি। প্রযুক্তিগত দক্ষতা ছাড়া ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থান হবে একটি দুরূহ বিষয়। যোগ্যতা দিয়েই লড়াই করতে হবে এবং টিকে থাকতে হবে। বিশাল তরুণ জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে রূপান্তরের জন্য সরকারের পাশাপাশি যুব সংগঠকদের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

প্রতিবেদন: ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

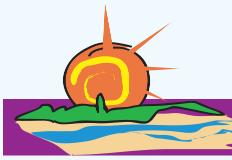

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

জলবায়ু বিপর্যয়ে স্বাস্থ্য ঝুঁকি

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিশ্বব্যাপী ঘূর্ণিঝড়, প্লাবন, খরা ও লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়া এবং বরফ গলে যাওয়া এ পাঁচটি স্পর্শকাতর ঝুঁকির বিষয় চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রথম চারটি বিষয় বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। এসব ঝুঁকি জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি বয়ে আনতে পারে।

মশাবাহিত ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, ম্যালেরিয়া বা পানিবাহিত কলেরা, ডায়রিয়ার মতো সংক্রামক রোগ ঘিরেই জলবায়ু প্রভাবজনিত ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছিলেন দেশের জনস্বাস্থ্য ও রোগতত্ত্ববিদরা। এবার গবেষণায় শুধু সংক্রামক রোগই নয়, অসংক্রামক রোগে মানুষের মৃত্যু ঝুঁকির বড়ো কারণ হিসেবে চিহ্নিত উচ্চ রক্তচাপের সাথে জলবায়ু বিরূপ প্রভাবের যোগসূত্র মিলেছে। এছাড়া হিটস্ট্রোক, গর্ভপাত, শ্বাসতন্ত্রের দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা, হাঁপানি, পানিশূন্যতাসহ বেশ কিছু রোগ বেড়ে যাওয়ার পেছনে জলবায়ুর বিরূপ প্রভাবকে দায়ী করা হচ্ছে।

জলবায়ু প্রভাবে সমুদ্র নদীর পানি হ্রাস বৃদ্ধি যেমন ঘটে, তেমনি তাপমাত্রা প্রভাবিত হয়ে থাকে। বায়ু দূষণের মাত্রাও বেড়ে যায়। শহর কিংবা গ্রামের মানুষই কোনো না কোনোভাবে প্রতিনিয়ত টের পাচ্ছে। আইসিডিডিআরবির একটি গবেষণায় দেখা গেছে, দেশে পানিবাহিত অসহনীয় মাত্রার লবণ থেকে মানুষের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপের প্রকোপ বাড়ছে। গর্ভবতী নারীদের গর্ভপাতের পেছনে অতি লবণাক্ততার প্রভাব থাকার প্রমাণ মিলেছে। সমুদ্র ও নলকূপের পানি পরীক্ষা করে অতিমাত্রায় লবণাক্ততার নজির পাওয়া গেছে। জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব থেকে এমনটি হচ্ছে বলে জানা গেছে। উপকূলীয় অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাবে ভূস্তরের পানির মতো ভূগর্ভস্থ পানিতেও লবণের মাত্রা বেড়ে গেছে। ফলে নলকূপের

পানিতে লবণ উঠছে অসহনীয় মাত্রায়। রাজধানী বা শহরাঞ্চলে পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া ও ভূগর্ভে পানির পরিমাণ কমে যাওয়ার পেছনে জলবায়ু বিরূপ প্রভাবের যোগসূত্র পাওয়া গেছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবে যেসব ঝুঁকি বাড়ে সেগুলো রোধ করতে বা কমিয়ে আনতে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। সরকারি-বেসরকারি এবং ব্যক্তিগত সব পর্যায়ে এসব পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। বায়ুদূষণ থেকে রক্ষার জন্য বাইরে বেরোনোর সময় মাস্ক ব্যবহার করা উচিত। অতি গরমে হালকা কাপড়চোপড় ও ছাতা ব্যবহার, তীব্র রোদ এড়িয়ে চলা এবং বেশি ঘাম হলে পানি পান করা জরুরি। লবণাক্ত প্রবণ এলাকায় যতটা সম্ভব বিশুদ্ধ পানির সংস্থান করা দরকার। ঘরবাড়ি যাতে মশার প্রজনন ঘাঁটি না হতে পারে, সেজন্য সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। অতি বর্ষায় যতটা সম্ভব শুকনো স্থানে থাকা এবং নিরাপদ পানি ব্যবহার ও পান করা উচিত। এসব ক্ষেত্রে বিশেষত শিশু ও বয়স্কদের প্রতি অধিক যত্ন নেওয়া প্রয়োজন।

কার্বণ না কমলে বাংলাদেশের বড়ো অংশ ডুবে যাবে

জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়ংকর ঝুঁকিতে এখন বাংলাদেশ। নতুন এক রিপোর্টে বলছে, ২১০০ সাল নাগাদ সমুদ্রস্তরের উচ্চতা বাড়তে পারে ৬২ সেন্টেমিটার থেকে ২৩৮ সেন্টিমিটার পর্যন্ত। বিশ্বে কার্বন নির্গমন কমানো না গেলে আর ৮০ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের এক বড়ো অংশ সাগরের পানির নিচে চলে যেতে পারে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত এক নতুন রিপোর্টে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে বিবিসি বাংলায়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা হয়েছিল। বিজ্ঞানীরা এখন সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, পানির স্তর অনেক বেশি বাড়ার কারণ গ্রিনল্যান্ড ও অ্যান্টার্কটিকায় জমে থাকা বরফ গলার হার দ্রুততর হওয়াই এর কারণ। এর ফলে ৮০ লাখ বর্গ কি.মি. পরিমাণ ভূমি সাগরের পানিতে তলিয়ে যাবে যার মধ্যে বাংলাদেশের এক বড়ো অংশ এবং মিশরের নীল নদ উপত্যাকা। বিপন্ন হবে লন্ডন, নিউইয়র্ক এবং সাংহাইয়ের মতো অনেক শহরের অস্তিত্ব। কোটি কোটি লোককে এর ফলে বাড়িঘর ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যেতে হবে। যে জায়গাগুলো পানির নিচে চলে যাবে তার অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ফসল ফলানো অঞ্চল, যেমন– নীল নদের বদ্বীপ।

প্রতিবেদন: রিপা আহমেদ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫শে মে ২০১৯ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ৪ লেনের মেঘনা ও গোমতী ২য় সেতু, জয়দেবপুর-চন্দ্রা-এলেঙ্গা মহাসড়কে কোনাবাড়ি ও চন্দ্রা ফ্লাইওভার, কালিয়াকৈর, দেওহাটা, মির্জাপুর, ঘায়িন্দা আন্ডারপাস এবং কড্ডা-১ ও বাইমাইল সেতু উদ্‌বোধন করেন–পিআইডি

নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

ঢাকায় টিকিট ছাড়া বাস সার্ভিস নয়

ঈদের পর রাজধানীর গণপরিবহণে টিকিটিং ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। এই সিদ্ধান্তের ফলে গণপরিবহণগুলোয় টিকিট ছাড়া আর কোনো যাত্রী ওঠা-নামা কিংবা যাত্রী পরিবহণ করতে পারবে না। ২০শে মে ২০১৯ ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) নগর ভবনে সাংবাদিকদের একথা জানান ডিএসসিসি মেয়র সাঈদ খোকন। বাস রুট রেশনালাইজেশন কমিটির নবম বৈঠক শেষে মেয়র বলেন, বাস রুট রেশনালাইজেশন কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, ঢাকা শহরের কোথাও টিকিট ছাড়া গণপরিবহণে যাত্রী চলাচল করতে পারবে না। এতে করে বিদ্যমান যে বাস সংকট এবং যাত্রীদের দুর্ভোগ তারও পরিত্রাণ হবে।

কোনাবাড়ী ও চন্দ্রায় উন্মুক্ত হচ্ছে দুটি ফ্লাইওভার

ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের গাজীপুরের কোনাবাড়ী ফ্লাইওভার ও চন্দ্রা ফ্লাইওভার ২৫শে মে ২০১৯ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এর উদ্‌বোধন করা হয়। এর ফলে কোনাবাড়ী ও চন্দ্রার দীর্ঘ যানজট থেকে যাত্রীরা রেহাই পাবে।

প্রতিবেদন: মো. সৈয়দ হোসেন

যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

২০২১ সালে চালু হবে মেট্রোরেল

রাজধানীতে ক্রমশ দৃশ্যমান হচ্ছে স্বপ্নের মেট্রোরেল। অধিকাংশ পিলারের ওপর বসছে স্প্যাম। মেট্রোরেলের প্রধান চ্যালেঞ্জ ছিল পাইলিং। সব চ্যালেঞ্জ জয় করে প্রতিনিয়তই এগিয়ে যাচ্ছে নির্মাণ কাজ। নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার পর স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন বর্ষ ২০২১ সালের বিজয় দিবসে বাংলাদেশের প্রথম উড়াল মেট্রোরেল আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্‌বোধন করা হবে। ২৯শে মে মেট্রোরেল নির্মাণ প্রকল্পের আগারগাঁও সাইট অফিসে নির্মাণকাজের অগ্রগতি নিয়ে এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ইতোমধ্যে পাঁচ কিলোমিটার ভায়াডাক্ট দৃশ্যমান হয়েছে। উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত উড়ালপথ ও স্টেশন নির্মাণের কাজ শেষ হওয়ার কথা ২০১৯ সালের জুনে। এরপর ১১ দশমিক ৭৩ কিলোমিটার ঢাকাবাসীর জন্য খুলে দেওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও তা বাস্তবায়ন হচ্ছে না। সূত্র মতে এখনই রুটটি খুলে দিলে আগারগাঁও এলাকায় নতুন ভোগান্তির সৃষ্টি হবে। এই অংশের নির্মাণকাজ চলতি বছরের ডিসেম্বরে শেষ হবে। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত সম্পূর্ণ নির্মাণকাজ ২০২০ সালের ডিসেম্বর নাগাদ শেষ হবে। তাই সংশ্লিষ্টরা এমন সংশোধিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। ২৯শে মে পর্যন্ত মেট্রোরেলের সার্বিক গড় অগ্রগতি ২৪ দশমিক ৬৯ শতাংশ। প্রথম পর্যায়ে নির্মাণের জন্য নির্ধারিত উত্তরা তৃতীয় পর্ব থেকে আগারগাঁও অংশের অগ্রগতি হয়েছে ৪০ দশমিক ৫৮ শতাংশ। এই অংশের কাজ শেষ হয়ে গেলে রেল ও বিদ্যুতের লাইন স্থাপন করা হবে। এরপরে রেল ট্রায়াল পর্যায়ে থাকবে। অন্যদিকে, আগারগাঁও মতিঝিল অংশের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে নেওয়া ও চলমান থাকবে। কাজ পুরোপুরি সেরে স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন বর্ষ ২০২১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরে আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন হবে বলে জানিয়েছে মেট্রোরেল প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)।

ডিএমটিসিএল ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) এমএন সিদ্দিক বলেন, প্রকল্পের রেল ও বিদ্যুতের লাইন চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছে গেছে। ভায়াডাক্ট নির্মাণের পর রেল ও বিদ্যুতের লাইন বসানোর কাজ শুরু হবে। রেল লাইনের ওপরে কোচও বসানো হবে। কোচে প্রাধান্য থাকবে লাল-সবুজের। উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত কোচ ট্রায়াল দেওয়া হবে। একদিকে ট্রায়াল, অন্যদিকে নির্মাণকাজ চলবে। পর্যায়ক্রমে ২০২১ সালের ডিসেম্বরে আমরা সম্পূর্ণভাবে অপারেশনে যেতে পারে।

মেট্রোরেলের উত্তরা থেকে আগারগাঁও অংশের দৈর্ঘ্য ১১ দশমিক ৭৩ কিলোমিটার এই অংশে নয়টি স্টেশন হবে। ২০১৭ সালের ১লা আগস্ট উভয় প্যাকেজের কাজ শুরু হয়েছিল। ইতোমধ্যে পরিষেবা স্থানান্তর, চেকবোরিং, টেস্ট পাইল ও মূল পাইল সম্পন্ন হয়েছে। ৭৬৬টি পাইল ক্যাপের মধ্যে ৬১৭টির কাজ শেষ। ৩৯৩টি পিয়ার হেডের মধ্যে ৩৩৩টির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া ১০৮টি আই গার্ডারের মধ্যে ১০০টি ও পাঁচ হাজার ১৪৯টি প্রিকাস্ট সেগম্যান্ট কাস্টিংয়ের মধ্যে দুই হাজার ৮৪২টি নির্মাণ হয়েছে। দৃশ্যমান হয়েছে তিন হাজার ৯৩০ মিটার ভায়াডাক্ট। এছাড়া রেলকোচ ও ডিপো ইকুইপমেন্ট সংগ্রহের কাজ চলছে। চলতি বছরের ১৬ ফেব্রুয়ারি জাপানে বগি নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। চূড়ান্ত হয়েছে এয়ার কন্ডিশন, ব্রেক ও ট্রেন ইনফরমেশন। উল্লেখ্য, রাজধানীর যানজট নিরসন ও নগরবাসীর যাতায়াত আরামদায়ক, দ্রুততর ও নির্বিঘ্ন করতে ২০১২ সালে গৃহীত হয়

মেট্রোরেল প্রকল্প। উত্তরায় দিয়াবাড়ি থেকে মতিঝিল পর্যন্ত এ প্রকল্পের দৈর্ঘ্য ২০ দশমিক ১ কিলোমিটার। এ এলাকায় বসবাসকারী লাখো নগরবাসী মেট্রোরেল ব্যবহার করে খুব কম সময়ের মধ্যে গন্তব্যে যেতে পারবেন। ২৪ সেট ট্রেন চলাচল করবে। প্রত্যেকটি ট্রেনে থাকবে ছয়টি করে কোচ। ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটার বেগে ছুটবে এ ট্রেন। উভয়দিক থেকে ঘণ্টায় ৬০ হাজার যাত্রী পরিবহণ বহনে সক্ষমতা থাকবে মেট্রোরেলের। প্রকল্পের ব্যয় ২১ হাজার ৯৮৫ কোটি টাকার মধ্যে জাপান সরকারের উন্নয়ন সংস্থা জাইকা দিচ্ছে ১৬ হাজার ৫৯৪ কোটি ৫৯ লাখ টাকা।

প্রতিবেদন: জাহিদ হোসেন নিপু

স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

জনপ্রিয়তা পাচ্ছে সুখি পরিবার কল সেন্টার

সরকারের পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতি মা-শিশু-স্বাস্থ্য, কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য বিষয়ে সার্বক্ষণিক পরামর্শ দিতে 'সুখি পরিবার' কল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এ কল সেন্টারের নম্বর ১৬৭৬৭। গত বছর ১৭ই জুলাই এ সেন্টার যাত্রা শুরু করে। সপ্তাহের প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টা এ সেন্টারে জরুরি প্রসূতিসেবা, প্রসব পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা সেবা, নবজাতক সেবা, পুষ্টি সেবাসহ বিভিন্ন সেবা সম্পর্কে পরামর্শ পাওয়া যাচ্ছে।

রোগীদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহারের বিকল্প নেই

রোগীদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহারের কোনো বিকল্প নেই। একই সঙ্গে নাগরিকদেরও চিকিৎসকদের পেশার প্রতি সম্মান দেখাতে হবে। ১৫ই জুন রাজধানীর একটি হোটেলে অ্যাসোসিয়েশন অব ফিজিশিয়ানস অব বাংলাদেশের (এপিবি) ৩০তম বার্ষিক সম্মেলন এবং আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সেমিনারের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন এসব কথা বলেন। ১৪ই জুন তিনদিনের এ সম্মেলন শুরু হয়। দেশি-বিদেশি প্রায় এক হাজার চিকিৎসক এই সম্মেলনে অংশ নেন।

স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্পে যুক্ত হলো আরো ১১টি শহর

স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্পে যুক্ত হয়েছে আরো ২টি সিটি করপোরেশন ও ৯টি পৌরসভা। স্থানীয় সরকার বিভাগ সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। এ প্রকল্পের অধীন ১০টি সিটি করপোরেশন ও ৪টি পৌরসভার ১১৩টি নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ২৫টি নগর মাতৃসদনে খুবই কম খরচে স্বাস্থ্যসেবা পান প্রায় ১ কোটি ৭০ লাখ মানুষ। প্রকল্পটিতে চিকিৎসক, প্যারামেডিক, নার্সসহ বিভিন্ন পদে ২ হাজার ৯০০ কর্মী চাকরি করেন। তাদের ৮০ শতাংশই নারী। সরকার আরো ১১টি শহরকে যুক্ত করায় সুবিধাভোগী মানুষের সংখ্যা আরো বেড়ে যাবে।

প্রতিবেদন: মো. আশরাফ উদ্দিন

মাদক প্রতিরোধ : বিশেষ প্রতিবেদন

ইয়াবায় জড়ালে হাতকড়া পড়বে পুলিশের হাতেও

কোনো পুলিশ সদস্য ইয়াবাসহ অনৈতিক কাজে জড়ালেই আর গোপনে শাস্তি নয়, এখন থেকে প্রকাশ্যে হাতকড়া পড়িয়ে জনসম্মুখে হাজির করা হবে। তাই সময় থাকতে এ কাজ থেকে সরে আসতে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ (সিএমপি) কমিশনার মাহবুবর রহমান। ১৫ই জুন সংবাদ মাধ্যমের এক প্রশ্নের জবাবে পুলিশ কমিশনার এ হুঁশিয়ারি দেন।

ক্রীড়াবিদরা চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসী কিংবা মাদকাসক্ত হতে পারে না

পার্বত্য অঞ্চলের রত্ন মনিকা চাকমা ফুটবলের মাধ্যমে সারা বিশ্বের দরবারে খাগড়াছড়িকে পরিচিত করেছে। প্রতিটি পরিবারে মনিকার মতো সন্তান গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে গুইমারা উপজেলা

চেয়ারম্যান মেমং মারমা বলেছেন, ক্রীড়াবিদরা কখনো চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসী বা মাদকাসক্ত হতে পারে না। তাঁরা দেশ ও জাতির অহংকার। ১৪ই জুন গুইমারা বাইল্যাছড়ি স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত বঙ্গবন্ধু ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। এসময় প্রধান অতিথি হিসেবে চেয়ারম্যান মেমং মারমা খেলায় চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ দলের মাঝে পুরস্কার তুলে দেন।

প্রতিবেদন: জান্নাত হোসেন

প্রতিবন্ধী : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রতিবন্ধীদের দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা হবে

প্রতিবন্ধীরা সমাজের বোঝা নয়। তাদের পড়াশোনা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা হবে। প্রতিবন্ধীদের দেশের সম্পদে পরিণত করার জন্য সরকার বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ উদ্যোগকে সফল করতে ওই শিশুদের অভিভাবকসহ সমাজের সব স্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। তাহলে প্রতিবন্ধীরা যে-কোনো কাজকে প্রতিবন্ধকতা মনে করবে না।

২রা জুন মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়ায় বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শিশুদের মাঝে ঈদের নতুন পোশাক বিতরণ অনুষ্ঠানে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেন এসব কথা বলেন। জেলা প্রশাসক মো. আতাউল গণির সভাপতিত্বে এ সময় উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার মোস্তাফিজুর রহমান, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদুল আলম, প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সদস্যসহ অভিভাবকরা। উপস্থিত সকলেই প্রতিবন্ধীদের সহযোগিতায় নিজেদের নিয়োজিত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নকে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে শেখ হাসিনার সরকার

বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থসামাজিক অগ্রযাত্রায় জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের অন্তর্ভুক্তি ও উন্নয়নকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার। আমরা দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কাজে প্রতিবন্ধীদের সম্পৃক্ত করার পাশাপাশি ‘প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সংক্রান্ত কনভেনশন (সিআরপিডি)’ ও এজেন্ডা ২০৩০-এর আলোকে প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালাসমূহও হালনাগাদ করেছি।

জাতিসংঘ সদর দপ্তরে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সংক্রান্ত কনভেনশন (সিআরপিডি) স্বাক্ষরকারী দেশসমূহের ১২তম সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তব্যে একথা বলেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন।

স্থায়ী প্রতিনিধি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কন্যা সায়মা ওয়াজেদ হোসেন প্রতিবন্ধী বিষয়ক একজন বিশেষ প্রবক্তা। তিনি বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার শুভেচ্ছাদূত ও বাংলাদেশের অটিজম বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি। সায়মা অটিজম ও প্রতিবন্ধিতার বিষয়ে বিশেষ করে বাংলাদেশ, এতদঅঞ্চল ও এর বাইরে ব্যাপকভাবে সচেতনতামূলক প্রচারণা ও ফলপ্রসু কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে যাচ্ছেন।

বাংলাদেশের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও এনজিওসহ বেসরকারি খাতসমূহ সরকারের এসকল প্রচেষ্টায় যুক্ত রয়েছে মর্মে উল্লেখ করেন রাষ্ট্রদূত মাসুদ।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের কল্যাণে বাংলাদেশ সরকার বাস্তবায়িত

ব্যাপক উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ তুলে ধরেন রাষ্ট্রদূত মাসুদ। তিনি বলেন, আসছে জুলাই মাস থেকে সরকার প্রায় ১৪ লাখ বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গকে ভাতা প্রদান করবে, আর বর্তমানে ভাতা প্রাপ্তদের এ সংখ্যা ১০ লাখ। ক্রীড়া ও উদ্ভাবনীসহ বিভিন্ন খাতে প্রতিবন্ধী যুবদের নানা সাফল্যগাঁথা তুলে ধরেন স্থায়ী প্রতিনিধি। এ বছর আবুধাবীতে প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ অলিম্পিকে অংশ নিয়ে বাংলাদেশ দল ২২টি স্বর্ণ জয়ের যে সাফল্য দেখিয়েছে তাও উল্লেখ করেন তিনি। এছাড়া স্থায়ী প্রতিনিধি বাংলাদেশের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ভাস্কর ভট্টাচার্যের বিশেষ উদ্ভাবনী-অবদানের কথা তুলে ধরেন।

উল্লেখ্য, ভাস্কর ভট্টাচার্য তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে চার ধরনের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রথমবারের মতো অভিধান তৈরি করেছেন এবং ইতোমধ্যে এটি ইউনেস্কোর স্বীকৃতি অর্জন করেছে। রাষ্ট্রদূত মাসুদ বলেন, সাফল্যের এসকল উদাহরণ সকল প্রতিবন্ধীদের ক্ষমতায়নের জন্যই অনুপ্রেরণার অনন্য উৎস হতে পারে।

রাষ্ট্রদূত বলেন, যদিও 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছি তথাপিও 'প্রতিবন্ধীদের অন্তর্ভুক্তি' বাস্তবায়নে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে আমাদের আরো অংশীদারিত্ব প্রয়োজন আর এক্ষেত্রে আমি উন্নয়ন সহযোগীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সিআরপিডি'তে অনুস্বাক্ষরকারী দেশসমূহের মধ্যে প্রথম সারির একটি দেশ।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের রেজ্যুলেশন ৬১/১০৬-এর মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সংক্রান্ত কনভেনশন (সিআরপিডি) গৃহীত হয়।

প্রতিবেদন: হাছিনা আক্তার

শিশু ও কিশোর উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস

১২ই জুন 'বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে পালিত হয়। এবার এ দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল– 'শিশুশ্রম নয়, শিশুর জীবন হোক স্বপ্নময়'। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। এর পূর্বশর্ত হিসেবে যেসব বিষয় রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে দেশ থেকে শিশুশ্রম নিরসন করা। বর্তমান সরকারও চাইছে জাতীয় শিশুশ্রম নীতিমালা অনুযায়ী ২০২৫ সালের মধ্যে দেশ থেকে শিশুশ্রম পুরোপুরি নিরসন করতে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৫ সালের জাতীয় শিশুশ্রম জরিপের তথ্যানুযায়ী, দেশে শ্রমের সঙ্গে যুক্ত প্রায় ৩২ লাখ শিশু। এর মধ্যে ১২ লাখ ৮০ হাজার শিশুই যুক্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজে।

বাল্যবিবাহের তথ্য দিলেই পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার

রাজবাড়ীতে বাল্যবিবাহ লেগেই আছে। প্রায়ই সংবাদপত্রে খবর আসে বাল্যবিবাহের। বাল্যবিবাহ ঠেকাতে নানা উদ্যোগের খবর চোখে পড়ে। এবার বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে এক অভিনব উদ্যোগের তথ্য মিলেছে। বাল্যবিবাহ ঠেকাতে এগিয়ে এসেছেন ফ্রান্স প্রবাসী ব্যবসায়ী ও রাজবাড়ীর বাসিন্দা মো. আশরাফুল ইসলাম। তাঁর পক্ষ থেকে ঘোষণা এসেছে, বাল্যবিবাহের তথ্য দিলেই তথ্যদাতাকে দেওয়া হবে নগদ পাঁচ হাজার টাকা। বাল্যবিবাহ আয়োজনের খবর পেলেই প্রশাসন বা জনপ্রতিনিধিকে জানাতে হবে। রাজবাড়ীর বেশ কয়েকটি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে ভূমিকা রাখায় প্রবাসীর দেওয়া পুরস্কারও পেয়েছেন কয়েকজন।

প্রতিবেদন: নাসিমা খাতুন

সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

উদীচীর বর্ষা বরণ

বাংলা ১৪২৬ সালে আষাঢ়ের প্রথম দিন সকালেই বর্ষা হাজির। নিয়ম করে ইট, কাঠ, পাথরের এই নগরে নামে বৃষ্টি। আর এমনই বর্ষণমুখর সকালে ছাতা মাথায় শুরু হয় কথা, গান ও নাচ। বৃষ্টিতে ভিজে একাকার অনুষ্ঠানস্থল। সার্থক হয় বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ ও চারুকলা অনুষদে আয়োজিত বর্ষা উৎসব। বাংলা একাডেমিতে বর্ষা উৎসব আয়োজন করে উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর ঢাকা মহানগর সংসদ। একাডেমির নজরুল মঞ্চে শিল্পী ইবাদুল হক সৈকতের সেতারে মেঘমল্লার রাগ পরিবেশনার মধ্য দিয়ে শুরু হয় বর্ষা উৎসব। এরপর শুরু হয় দলীয় নৃত্য, দলীয় ও একক সংগীত এবং আবৃত্তি।

অনুষ্ঠানের মাঝামাঝি বর্ষা কথন পাঠ করেন উদীচী ঢাকা মহানগরের সাধারণ সম্পাদক ইকবালুল হক খান। এ পর্বে অধ্যাপক নিগার চৌধুরীর সভাপতিত্বে অংশ নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান। সত্যেন সেন শিল্পী গোষ্ঠীর সাধারণ সম্পাদক মানজার চৌধুরী সুইটি।

স্মরণে ও শ্রদ্ধায় শাহনাজ রহমতুল্লাহ, সুবীর নন্দী

দ্য ডেইলি স্টার আয়োজিত বাংলা গানের নিয়মিত আয়োজন 'স্টার মেলোডিজ'-এ গানে গানে সম্মান জানায় সংগীতশিল্পী শাহনাজ রহমতুল্লাহ ও সুবীর নন্দী। এবারের পর্বের নাম দেওয়া হয় স্মরণে ও শ্রদ্ধায় ১৫ই জুন রাজধানীর কাজী নজরুল ইসলাম দ্য ডেইলি স্টার সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয় স্মরণে ও শ্রদ্ধায় অনুষ্ঠানটি। শিল্পী শাহনাজ রহমতুল্লাহ পরপারে চলে যান এ বছরের ২৩শে মার্চ এবং সুবীর নন্দী চলে যান ৭ই মে। তাদের গাওয়া গানগুলো গেয়ে শোনান অনুপমা মুক্তি, সাব্বির, অপু ও স্বরলিপি। সার্বিক সমন্বয় ও সঞ্চালনা করেন কালচার ইনিশিয়েটিভের প্রধান সাদিয়া আফরিন মল্লিক।

ইকবাল বাহারের চিত্র প্রদর্শনী

গুহার ভেতরে ছড়িয়ে থাকে নানা রকমের নুড়ি কিংবা পাথর। সেই নুড়ি পাথরের মাঝেই নানা অবয়বের সন্ধান পেয়েছেন শিল্পী ইকবাল বাহার চৌধুরী। শিল্পীর নিজস্ব অবলোকনের সেসব অবয়ব মেলে ধরেছেন চিত্রপটে। ছাপচিত্র এবং জল রঙের ক্যানভাসে চমৎকারভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে সেসব বিষয়। এ রকম বেশ কিছু ছবি নিয়ে ধানমন্ডির অলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দ্য ঢাকায় লা গ্যালারিতে ১৪ই জুন শুরু হয় এই চিত্রকরের প্রদর্শনী 'নুড়ি ও কণা'। এ প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন করেন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী শহীদ কবির। প্রদর্শনীটি চলে ২৯শে জুন পর্যন্ত।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

চলচ্চিত্র : বিশেষ প্রতিবেদন

ঈদের তিন ছবি

এবারের ঈদুল ফিতরে তিনটি ছবি মুক্তি পেয়েছে। মুক্তি পাওয়া তিনটি ছবির মধ্যে দুটি বাণিজ্যিক ধারার ও একটি মৌলিক গল্পের। ছবিগুলো হলো– পাসওয়ার্ড, নোলক এবং আবার বসন্ত। এর মধ্যে

প্রথম দুটি বাণিজ্যিক ছবির নায়ক শাকিব খান। আর আবার বসন্ত ছবিটিতে মুখ্য দুটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন– তারিক আনাম খান এবং স্পর্শিয়া। এই ঈদের এক নাম্বার ব্যবসা-সফল ও দর্শকপ্রিয় ছবি হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে শাকিব খান প্রযোজিত ও অভিনীত 'পাসওয়ার্ড'। ঈদে মধুমিতাসহ সারা দেশের ১৮০টি সিনেমা হলে পাসওয়ার্ড ছবিটি মুক্তি পায়।

বাংলা একাডেমির প্রাঙ্গণে উদীচীর শিল্পগোষ্ঠীর বর্ষা বরণ

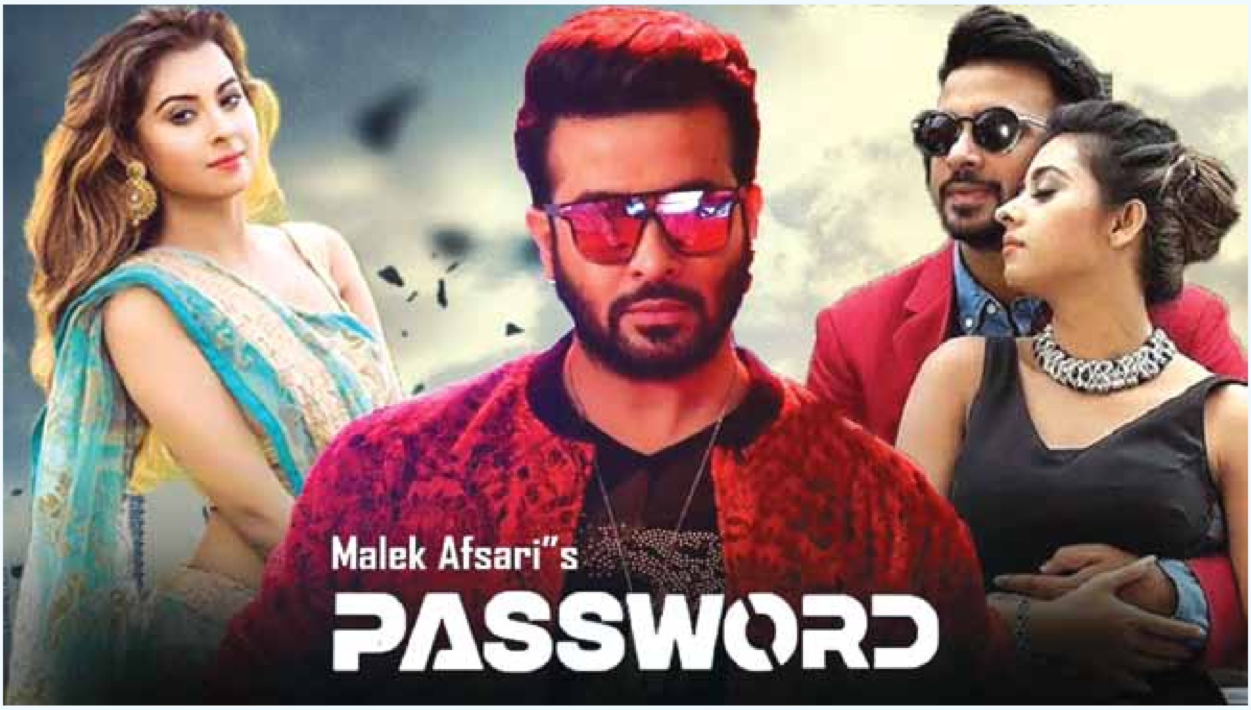

নিউইয়র্কে আজীবন সম্মাননায় শাবানা-আলমগীর

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রকে বিশ্ব দরবারে নতুন করে পরিচিত করতে দ্বিতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলা সিনে অ্যাওয়ার্ড-২০১৮। এ উৎসবে আজীবন সম্মাননা পেয়েছেন শাবানা ও আলমগীর। ১৩ই জুলাই আমেরিকার নিউইয়র্কের জ্যামাইকাতে অনুষ্ঠিত হয় এ উৎসব। মরণোত্তর অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় নায়করাজ রাজ্জাক, সালমান শাহ, জনপ্রিয় গায়ক সুবীর নন্দী ও বারী সিদ্দিকীকে। বাংলাদেশের বিএনএস লজিস্টিকস এবং আমেরিকার ব্যাকডিস ইন করপোরেশন, নিউইয়র্ক যৌথভাবে এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে। এ অনুষ্ঠানের মিডিয়া পার্টনার এটিএন বাংলা এবং সিটি এফএম।

বায়োস্কোপ আড্ডায় আপন চৌধুরী

তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতা, চলচ্চিত্রযোদ্ধা ও চলচ্চিত্রকর্মীদের নিয়ে বায়োস্কোপ আড্ডা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়। ২৫শে জুন বায়োস্কোপ আড্ডায় অতিথি করা হয় তরুণ সাংবাদিক ও চলচ্চিত্র নির্মাতা আপন চৌধুরীকে। এ অনুষ্ঠানে তিনি তাঁর সাংবাদিকতা ও চলচ্চিত্র জীবন নিয়ে আলোচনা করেন। তার সঙ্গে এই আড্ডায় যোগ দেন তরুণ চলচ্চিত্রকার, অভিনেতা, অভিনেত্রী, কলাকুশলী, দর্শকসহ অনেকেই। এছাড়াও আড্ডায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (বিসিটিআই)-এর বর্তমান ও সাবেক শিক্ষার্থীরা। মাহিদ ইমরান জিতুর সঞ্চালনায় দিনব্যাপী এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত হয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ধীন বিসিটিআই প্রযোজিত আপন চৌধুরী পরিচালিত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র স্বপ্নভঙ্গ (২০১৮)।

প্রতিবেদন: মিতা খান

বায়োস্কোপের আড্ডায় আপন চৌধুরী

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী: বিশেষ প্রতিবেদন

পার্বত্য চট্টগ্রামে বাজার স্থাপনে ভূমি বন্দোবস্তের সিদ্ধান্ত গৃহীত

১২ই জুন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে তিন পার্বত্য জেলার ভূমি বন্দোবস্ত প্রদানের ক্ষেত্রে আরোপিত স্থগিতাদেশ শিথিল বিষয়ক একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভায় পার্বত্য চট্টগ্রামের বন্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার জনগণের চাহিদা বিবেচনায় সুবিধাজনক স্থানে বাজার স্থাপনের জন্য ভূমি বন্দোবস্তের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইতঃপূর্বে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, শ্মশান,

কবরস্থান ইত্যাদি। বাণিজ্যিক কারণে বাজার ফান্ডের জমি কেবল স্বল্পমেয়াদি ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে, সরকারের কোনো দপ্তরের জরুরি প্রয়োজনে, মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ (সর্বোচ্চ ৫ শতাংশ, প্রতি উপজেলা সদরে একটি), স্থানীয় পর্যটন (জেলা পরিষদের ব্যবস্থাপনায় মাস্টার প্ল্যানের ভিত্তিতে), জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্কাউটস/গার্লস গাইড ভবন নির্মাণ (সর্বোচ্চ ৫ শতাংশ), জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শিশু পার্ক/বিনোদন কেন্দ্র স্থাপন (শুধু পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভা এর ব্যবস্থাপনায়) মোট ৯টি বিষয়ে স্থাপনা নির্মাণের জন্য ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হতো। সভায় জানানো হয় পার্বত্য অঞ্চলের ভূমি সমস্যা নিরসনে বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বান্দরবানে পার্বত্য বৌদ্ধ ভিক্ষু সম্মেলন

বান্দরবান শহরের অরুণ সারকী টাউন হলে ৩১শে মে থেকে ১লা জুন পর্যন্ত দুদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হলো পার্বত্য বৌদ্ধ ভিক্ষু সম্মেলন। 'বিশ্ব শান্তির প্রেক্ষাপটে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমসাময়িক বৌদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জীবনধারা'– এই ছিল পার্বত্য বৌদ্ধ ভিক্ষু সম্মেলনের প্রতিপাদ্য। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বৌদ্ধ ধর্মীয় ও জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং এমপি। এসময় দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনায় বিশেষ প্রার্থনা, মঙ্গলাচরণ, বৌদ্ধ ধর্মীয় গুরুরা বক্তব্য রাখেন। পার্বত্য এই বৌদ্ধ ভিক্ষু সম্মেলন বক্তারা পার্বত্য এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রত্যেক বৌদ্ধ ভিক্ষুর প্রতি আহ্বান জানান। সম্মেলনের শেষ দিনব্যাপী আলোচনা সভা, উন্মুক্ত আলোচনা, ছোয়াইং গ্রহণ, ধর্মীয় দেশনার মধ্য দিয়ে ২ দিনব্যাপী পার্বত্য বৌদ্ধ ভিক্ষু সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে। পার্বত্য ভিক্ষু পরিষদের আয়োজনে ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে তিন পার্বত্য জেলার ৫ শতাধিক বৌদ্ধ ভিক্ষু, হেডম্যান, কারবারী ও বৌদ্ধ ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বান্দরবানে ভিজিএফ'র চাল বিতরণ

বান্দরবানের রাজবিলা ইউনিয়নের ১১৩০ পরিবারের মাঝে ১লা জুন ভিজিএফ চাল বিতরণ করেন পার্বত্যমন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং এমপি। এই সময় দুঃস্থ পরিবারের মাঝে ১৫ কেজি হারে ভিজিএফের চাল বিতরণ করা হয় এবং ২রা জুন সদর ও কুহালং ইউনিয়নে ২ হাজার ৫শত ৯০ পরিবারের মাঝে ভিজিএফ চাল বিতরণ করা হয়।

দেশ সেরা খাগড়াছড়ির তিন কৃতি কিশোরী ফুটবলারের বর্ণাঢ্য গণসংবর্ধনা

দেশ সেরা খাগড়াছড়ির তিন কিশোরী ফুটবলার মনিকা-আনাই ও অনুচিং-কে ৩রা জুন খাগড়াছড়ি অফিসার্স ক্লাবে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে পার্বত্য জেলা পরিষদ ও জেলা ক্রীড়া সংস্থা। পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কংজরী চৌধুরীর সভাপতিত্বে গণসংবর্ধনায় প্রধান অতিথি ছিলেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব কবির বিন আনোয়ার। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, পাহাড়ের এ তিন কন্যা খাগড়াছড়িকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। অনুষ্ঠানে এই তিন কন্যা-কে ফুল দিয়ে বরণ করা হয় এবং সম্মাননা ক্রেস্ট দেওয়া হয়। পাহাড়ি এই তিন কন্যাই বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা আন্তঃস্কুল ফুটবল থেকে উঠে আসা।

প্রতিবেদন: আসাব আহমেদ

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

বিশ্বকাপ ক্রিকেটের উদ্‌বোধন

আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০১৯ কে স্বাগত জানাল সারা বিশ্ব। বাকিংহাম প্যালেসের সামনে ২৯শে মে বাংলাদেশ সময় রাত ১০টায় লন্ডন দ্য মলে শুরু হয় উদ্‌বোধন অনুষ্ঠান। ওভালে ইংল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার মুখোমুখি হওয়ার মধ্য দিয়ে শুরু হয় ক্রিকেটের সবচেয়ে এই বড়ো আয়োজন। সাধারণত বিশ্বসেরা ক্রীড়া ইভেন্টগুলোর উদ্‌বোধন হয় স্বাগতিক দেশের ঐতিহাসিক কোনো স্টেডিয়ামে। তবে সেই রীতি ভেঙে এবার নতুন আঙ্গিকে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস।

ব্রিটিশদের ইতিহাস-ঐতিহ্যের স্বাক্ষর বহন করে আসছে যে জায়গা, সেই বিখ্যাত দ্য মলেই পর্দা উঠেছে এবারের ক্রিকেট

বিশ্বকাপের দ্বাদশ আসরের। তারা এখানেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিজয় উৎসব করেছিল। বিশ্বকাপের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠান সরাসরি দেখানো হয় টেলিভিশনের পর্দায়। ১ ঘণ্টা ২০ মিনিটের এই অনুষ্ঠানে ছিল ক্রিকেট উদ্‌যাপন, সংগীত ও সংস্কৃতির দৃষ্টিনন্দন বিভিন্ন প্রদর্শনী। আইসিসির প্রতিটি দেশের সদস্য দূতরা এক মিনিট ধরে ব্যাট করেন। উপস্থিত দর্শকরা দিতে থাকেন জয়ধ্বনি। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আব্দুর রাজ্জাক ও জয়া আহসান বাকিংহামের মাঠে নামেন। এর আগে ব্রিটেনের রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের অতিথি হয়ে সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য বাকিংহাম প্যালেসে যান বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া ১০ দলের অধিনায়ক। সাক্ষাৎ শেষে মাশরাফিরা অংশ নেন বিশ্বকাপের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে।

দুর্দান্ত জয় দিয়ে শুরু টাইগারদের বিশ্বকাপ মিশন

পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে বাংলাদেশ আর দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে পার্থক্য অনেক মনে হয়। ২রা জুনের খেলার আগ অবধি বিশবার মুখোমুখি হয়েছিল এ দু'দল। তারমধ্যে সতেরো বারই জিতেছিল প্রোটিয়ারা।

ক্রিকেটের সবচেয়ে বড়ো আসরে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারানোর সেই স্মৃতি ওভালে যে ফিরতে পারে সেই ইঙ্গিত বাংলাদেশ প্রথম ইনিংসেই দিয়েছিল। তামিম-সৌম্যর চমৎকার সূচনার পর সাকিব-মুশফিকের রেকর্ড জুটি আর শেষ বেলায় মাহামুদুল্লাহ-মোসাদ্দেকের লড়াকু ব্যাটিংয়ে এখন অবধি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বোচ্চ স্কোর ৩৩০ রানের সেই ইনিংস করে ফেলে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের দেওয়া ৩৩১ রানের টার্গেটে নেমে ৮ উইকেট হারিয়ে ৩০৯ রান করতে সক্ষম হয় দক্ষিণ আফ্রিকা। যার ফলে বাংলাদেশ জয় পায় ২১ রানে।

আরেকটি রেকর্ডের সামনে সাকিব!

৬ই জুন বিশ্বকাপে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ব্যাট হাতে ৬৪ রান করার পাশাপাশি বল হাতে ৪৭ রানের খরচায় ২টি উইকেট শিকার করেন বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান। আর এর মাধ্যমে দক্ষিণ আফ্রিকার কিংবদন্তি ক্রিকেটার জ্যাক ক্যালিসকে ছাড়িয়ে এবার আরো একটি রেকর্ডের হাতছানি এখন সাকিব আল হাসানের সামনে।

সরাসরি অলিম্পিকে, বাংলাদেশি আর্চারের ইতিহাস

ইতিহাস গড়লেন বাংলাদেশি আর্চার রোমান সানা। টোকিও অলিম্পিকে সরাসরি খেলার যোগ্যতা অর্জন করলেন বাংলাদেশের এই আর্চার। নেদারল্যান্ডসে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপের পুরুষ রিকার্ভ ইভেন্টে সেমিফাইনালে ১৩ই জুন খেলার সুবাদে এ সুযোগ পেলেন তিনি।

প্রতিবেদন: মো. মামুন হোসেন

সচিত্র বাংলাদেশের মফস্বল এজেন্ট

কবি আ. ওয়াহাব
গ্রাম : দুধস্বর, ডাকঘর : ভাটই
উপজেলা : শৈলকূপা, জেলা : ঝিনাইদহ

আখতার হামিদ খান
সহযোগী অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
সাভার কলেজ, সাভার, ঢাকা

ঢাকার স্থানীয় এজেন্ট

মো. ইউনুস, পীরজঙ্গী মাজার, মতিঝিল, ঢাকা
মিলন, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা
আব্দুল হান্নান, কমলাপুর, ঢাকা
সৃজনী, কমলাপুর, ঢাকা
আমির বুক হাউজ, পুরানা পল্টন, ঢাকা
পাঠশালা, শাহবাগ, ঢাকা
আলীরাজ, শাহবাগ, ঢাকা।

এ সকল এজেন্টের কাছ থেকে **সচিত্র বাংলাদেশ** ক্রয় করা যাবে।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

বরেণ্য সংগীত শিল্পী ও গবেষক খালিদ হোসেন আর নেই

আফরোজা রুমা

নজরুল গীতির বরেণ্য শিল্পী, গবেষক, স্বরলিপিকার ও একুশে পদকপ্রাপ্ত সংগীতগুরু খালিদ হোসেন আর আমাদের মাঝে নেই। ২২শে মে রাত ১০টা ১৫ মিনিটে তিনি রাজধানীর জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের করোনারি কেয়ার ইউনিটে (সিসিইউ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। তিনি হৃদরোগের পাশাপাশি কিডনি রোগসহ নানা জটিলতায় ভুগছিলেন। খালিদ হোসেনের চিকিৎসার সহায়তার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছিল। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

খালিদ হোসেন ১৯৩৫ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের (বর্তমান ভারত) পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। দেশ বিভাগের পর তিনি পরিবারের সাথে কুষ্টিয়ার কোর্টপাড়ায় চলে আসেন। ১৯৬৪ সাল থেকে তিনি স্থায়ীভাবে ঢাকায় বসবাস শুরু করেন।

খালিদ হোসেন শুধু নজরুলগীতির শিল্পী ছিলেন না তিনি বিগত ৫ দশক ধরে বাংলাদেশে নজরুলগীতির শিক্ষক, গবেষক ও শুদ্ধ স্বরলিপি প্রণয়নে কাজ করেন। তিনি সংগীত প্রশিক্ষক ও নিরীক্ষক হিসেবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশের সকল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ও বাংলাদেশ টেক্সটবুক বোর্ডে দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া তিনি নজরুল ইনস্টিটিউটের নজরুলগীতির আদি সুরভিত্তিক নজরুল স্বরলিপি প্রমাণীকরণ পরিষদের সদস্য ছিলেন। এ পর্যন্ত শিল্পী খালিদ হোসেনের ছয়টি নজরুল গীতির অ্যালবাম প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর সর্বশেষ নজরুল গীতির অ্যালবাম হলো– 'শাওনো রাতে যদি'। এছাড়া তাঁর ১২টি ইসলামি গানের অ্যালবামও প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর একমাত্র আধুনিক গানের অ্যালবাম হলো 'চম্পা নদীর তীরে'। তিনি নজরুলগীতিতে অবদানের জন্য ২০০০ সালে একুশে পদক পান। এছাড়াও তিনি নজরুল একাডেমি পদক, শিল্পকলা একাডেমি পদক, কলকাতা থেকে চুরুলিয়া পদকসহ আরো অসংখ্যা পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেন।

নজরুলগীতির বরেণ্য এ শিল্পীর উল্লেখযোগ্য কিছু গান যেমন–

- আমার যাবার সময় হলো;
- শোনো শোনো ইয়া এলাহি;
- আধো আধো বোল;
- কার মঞ্জির রিনিঝিনি বাজে;
- আসিলে এ ভাঙা ঘরে;
- এল কে কাবার ধারে;
- তোমার নামের এ কি নেশা;
- প্রশংসা সবই কেবল তোমারি;
- হাত পেতেছে এই গুনাহগার।

খালিদ হোসেন বাংলা সংগীতাঙ্গনের এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম। তিনি তাঁর সৃষ্টিগুলোতে বেঁচে থাকবেন অনন্তকাল। ২৩শে মে মোহাম্মদপুরের তাজমহল রোডের এক মসজিদে প্রথম জানাজা সম্পন্ন হওয়ার পর সকাল ১০টায় তার মরদেহ নেওয়া হয় জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ইনস্টিটিউটে। এরপর কুষ্টিয়ার কোর্টপাড়ায় মায়ের কবরের পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।